ষষ্ঠ অধ্যায়

বিজ্ঞানময় কিতাব

মূর্খরা সব শোনো, মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনে নি মানুষ কোনো
কাজী নজরুল ইসলাম

মহাবৈজ্ঞানিক গ্রন্থে স্থির পৃথিবী

এই প্রবন্ধটির সূচনা হয়েছিল একটি নির্দোষ ই-মেইলের জবাব দিতে গিয়ে। বছর সাতেক আগে আমি (অভিজিৎ রায়) তখন সবে বাংলাদেশ থেকে পাড়ি জমিয়েছি বাইরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিনা পয়সায় ইন্টারেনেট ব্যবহারের আমেজ সামলাতে সময় লাগছে। কুয়োর ব্যাঙ-কে কুয়ো থেকে তুলে সমুদ্রে ছেড়ে দিলে যেমন দশা হয় তেমনি দশা তখন আমার। কম্পিউটার নামের চার কোনা বাক্সের মাঝে জ্ঞানের অবারিত দুয়ার। আমি নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে পড়ে রইলাম সমুদ্র সিঞ্চনে। এমনি এক সময় সদ্য পরিচিত এক ভদ্রলোকের পাঠানো এক ই-মেইলে এক ওয়েব-সাইটের ঠিকানা পেলাম। ঠিকানাটা আসলে একটা অন-লাইন পত্রিকার। খুব যে আগ্রহ নিয়ে গেলাম তা নয়। কিন্তু গিয়ে অবাকই হলাম। পড়লাম বেশ কিছু লেখকের তথ্যবহুল উঁচুমানের লেখা। অজানা অচেনা পত্রিকায় এমন যুক্তিবাদী ইহজাগতিক লেখা? তাও আবার লিখছে কিছু সাহসী বাঙালি। সত্যিই অবাক করার মতো ব্যাপার।

অবশ্য পত্রিকাটিতে সকলেই যে ধর্মের শিকল থেকে মুক্ত হয়ে প্রগতিশীল লেখা লিখতেন বা লিখছেন, তাও নয়। পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এক ভদ্রলোকের কথা খুব-ই মনে পড়ছে। উনি সবসময়ই একটি বিশেষ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব খুঁজতেন। এই ফ্যাশনটা ইদানীংকালে বাংলাদেশি শিক্ষিত মুসলমানদের ভেতরে প্রকট আকারে চোখে পড়ছে। বিশেষত দুই বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলি এবং কিথ মূরের 'অবিস্মরণীয়' অবদানের পর (ইদানীং সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে তুরস্কের হারুন ইয়াহিয়া নামের আরেক ছদ্ম-বিজ্ঞানী) আজ তারা ১৪০০ বছর আগের লেখা ধর্মগ্রন্থের মধ্যে 'বিগব্যাঙ' খুঁজে পান, মহাবিশ্বের প্রসারণ খুঁজে পান, মানব সৃষ্টির ক্রমবিকাশ খুঁজে পান, অণু-পরমাণু, ছায়াপথ, নক্ষত্ররাজি, শ্বেত বামন, কৃষ্ণগহ্বর, ভ্রুণ-তত্ত্ব, আপেক্ষিক তত্ত্ব, সুপার স্ট্রিং তত্ত্ব, সবই অবলীলায় পেয়ে যান। তো সেই ভদ্রলোকও বুকাইলি-মুরের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে কোরআন যে কত 'সুপার সায়েন্টিফিক' বই, তা প্রমাণের জন্যে পাতার পর পাতা লিখে যেতে থাকলেন। কাঁহাতক আর পারা যায়! আমি অবশেষে তার একটি লেখার প্রতিবাদ করবার সিদ্ধান্ত নেই। বলি, 'কী দরকার আছে এই হাজার বছর আগেকার কতকগুলো সুরার মধ্যে বিগব্যাঙের তত্ত্ব অনুসন্ধান করার? বিগব্যাঙ সম্বন্ধে জানতে চাইলে অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের উপর গাদা গাদা বই বাজারে আছে; দেখুন না। ডিফারেনসিয়াল ইকুয়েশন সমাধানের জন্য তো আমাদের গণিতের বই-ই দেখতে হবে, কোরআন-হাদিস চষে ফেললে কি এর সমাধান মিলবে?' এ যেন বারুদে আগুন লাগলো। উনি এর পরদিন বিশাল মহাভারত আকারের মহাকাব্য লিখে বুঝিয়ে দিলেন ইসলাম এবং বিজ্ঞান বিষয়ে আমার জ্ঞান কত তুচ্ছ; কত নগণ্য, কত অজ্ঞ, কত আহাম্মক আমি। এদিক-ওদিক-সেদিক থেকে দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত হাজির করে 'প্রমাণ' করে বুঝিয়ে পর্যন্ত দিলেন- 'দ্যাখ ব্যাটা- কোরআনে আধুনিক বিজ্ঞানের সবকিছুই আছে, কোরআন কত বিজ্ঞানময় কিতাব !'

এরপর আমাকেও কি-বোর্ড তুলে নিতে হলো। কী করব, পিঠ যে তখন দেয়ালে ঠেকে গেছে। বললাম, একটু চোখ-কান খুলে যদি ধর্মগ্রন্থগুলোর ইতিহাসের দিকে তাকানো যায়, তাহলে বোঝা না যাওয়ার তো কথা নয় যে, সেই গ্রন্থগুলো লেখা হয়েছে বহু বছর আগে যখন মানুষের বিজ্ঞানের উপর

দখল এবং জ্ঞান ছিল খুবই সীমিত। এটা আশা করা খুবই বোকামি যে সেই সময়কার লেখা একটা বইয়ের মধ্যে বিগব্যাঙের কথা থাকবে, সুপার স্ট্রিং এর কথা থাকবে, আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির কথা থাকবে। আধুনিক বিজ্ঞান নয়, ওই সমস্ত বইগুলোতে ফুটে উঠেছে প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার চালচিত্র, প্রকাশ পেয়েছে তৎকালীন সমাজের মানুষের ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস, আশা-আকাঙ্খার কথা; এর এক চুলও বাড়তি কিছু নয়। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। কোরআন যখন লিখিত হয়েছিল, তখনো গ্যালিলিও, ব্রুনো, কোপার্নিকাসের মতো মনীষীরা এই ধরাধামে আসেন নি। তখনকার মানুষদের আসলে জানবার কথা নয় যে তাদের পরিচিত বাসভূমি- পৃথিবী নামক এই গ্রহটি যে সূর্য নামক নক্ষত্রের চারিদিকে ক্রমাগত পাক খেয়ে চলেছে। জন্মের পর থেকেই মানুষ সাদা চোখে সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমে যেতে দেখেছে, আর রাত হলেই দেখেছে চাঁদ কে। এর পেছনে পদার্থবিজ্ঞানের কোনো নিয়ম তারা কল্পনা করতে পারে নি, ধরে নিয়েছিল, এগুলো বোধহয় ঈশ্বরের আইন। ঠিক সে কথাগুলোই কোরআন-হাদিস-বেদ-বাইবেলে লেখা আছে। যেমন, ধরা যাক সুরা লুকমান (৩১:২৯) এর কথা। এখানে বলা আছে- 'আল্লাহই রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিবর্তন করেন, তিনিই সূর্য এবং চন্দ্রকে নিয়মাধীন করেছেন; প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট পথে আবর্তন করে'। সূর্য আর চাঁদের এই ভ্রমণের কথা শুধু সুরা লুকমানে নয়, রয়েছে সুরা ইয়াসিন (৩৬:৩৮), সুরা যুমার (৩৯:৫), সুরা রা'দ (১৩:২), সুরা আম্বিয়া (২১:৩৩), সুরা বাকারা (২:২৫৮), সুরা কা'ফ (১৮:৮৬), সুরা ত্বোয়াহায় (২০:১৩০)। কিন্তু সারা কোরআন তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও পৃথিবীর ঘূর্ণনের সপক্ষে একটি আয়াতও মিলবে না। আল্লাহর দৃষ্টিতে পৃথিবী স্থির, নিশ্চল। সুরা নামলে (২৭:৬১) পরিষ্কার বলা আছে- 'কে দুনিয়াকে বসবাসের স্থান করেছেন আর তার মধ্যে নদীসমূহ সৃষ্টি করেছেন আর এটিকে (পৃথিবী) স্থির রাখবার জন্য পাহাড়-পবর্ত সৃজন করেছেন ...'। একইভাবে সুরা রূম (৩০:২৫), ফাত্বির (৩৫:৪১), লুকমান (৩১:১০), বাকারা (২:২২), নাহল (১৬:১৫) পড়লেও সেই এক-ই ধারণা পাওয়া যায় যে কোরআনের দৃষ্টিতে পৃথিবী আসলে স্থির।

আমি ভদ্রলোককে সবিনয়ে বলেছিলাম, তিনি যদি সত্যিই মনে করেন যে আধুনিক বিজ্ঞানের সকল তত্ত্ব ই কোরআনে আছে, তাহলে শুধুমাত্র একটি আয়াত যদি কোরআন থেকে দেখাতে পারেন যেখানে লেখা আছে 'পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে', অথবা নিদেন পক্ষে 'পৃথিবী ঘুরছে'- আমি তার সকল দাবি মেনে নেব। আরবিতে পৃথিবীকে বলে 'আরদ' আর ঘূর্ণন হচ্ছে 'ফালাক'। একটি মাত্র আয়াত আমি দেখতে চাই যেখানে 'আরদ' এবং 'ফালাক' পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে। উনি দেখাতে পারলেন না।

পারার কথাও নয়। কারণ কোরআনে এধরনের কোনো আয়াত নেই। এর কারণটা আমি আগেই বলেছি। তখনকার যুগের মানুষেরা চিন্তা করে তো বের করতে পারে নি পৃথিবীর আহ্নিক আর বার্ষিক গতির কথা। টলেমির পৃথিবী কেন্দ্রিক মতবাদকে মাথা থেকে সরিয়ে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদে মানুষের চিন্তা-ভাবনার উত্তরণ ঘটেছে আসলে আরও অনেক বছর পরে। হযরত মুহাম্মদের যুগে মানুষেরা এমন কি 'রাত্রিবেলা সূর্য কোথায় থাকে'- এই রহস্য ভেদ করতে গিয়ে 'গলদ-ঘর্ম' হয়ে উঠেছিল। পৃথিবী সমতল এ জ্ঞান খাটিয়ে মানুষ তখন ধারণা করতো একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে 'সূর্যদেব সত্যিই অস্ত যান!' চিন্তাশীল পাঠকেরা জুলকারনাইনের কথা উল্লেখিত, কোরআনের সেই বিখ্যাত সুরাটিতে চোখ বুলালেই বিষয়টি বুঝতে পারবেন-

> অবশেষে যখন সে সূর্যাস্তের দেশে পৌঁছালো, সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে ডুবতে দেখল এবং সেখানে দেখতে পেল এক জাতি। আমি বললাম, হে জুলকারনাইন, হয় এদের শাস্তি দাও, না হয় এদের সাথে ভালো ব্যবহার কর। (১৮:৮৬)

যারা কোরআনের মধ্যে অনবরত বিগব্যাঙ, এবং সুপার স্ট্রিং তত্ত্বের খোঁজ করেন, তারা কি একবারের জন্যও ভাবেন না আল্লাহ কেমন করে এত বড় ভুল করলেন! কীভাবে আল্লাহ ভাবলেন যে সূর্য সত্যিই কোথাও না কোথাও অস্ত যায়? কোরআন কি 'মহা বিজ্ঞানময়' কিতাব নাকি ভ্রান্তি-বিলাস? অনেক পাঠকই হয়তো জানেন না যে মহানবী মুহাম্মদকে শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ ও দার্শনিক বলে অভিহিত করা হয়, তিনি 'রাতে

সূর্য কোথায় থাকে'- এই রহস্যের কী ব্যাখ্যা দিয়েছিলেনঃ এক সাহাবার (আবু যর) সাথে মতবিনিময় কালে মহানবী বলেছিলেন যে, রাত্রিকালে সূর্য থাকে খোদার আরশের নিচে। সারা রাত ধরে সূর্য নাকি খোদার আরশের নিচে থেকে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করে আর তারপর অনুমতি চায় ভোরবেলা উদয়ের (সহি বোখারি, হাদিস নং ৬/৬০/৩২৬-৩২৭, ৪/৫৪/৪২১)[1]। পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে সূর্য যে আমাদের দৃষ্টির আড়াল হয় (একইভাবে বিপরীতে অবস্থানকারীদের দৃষ্টিগোচর হয়) সেটা ছিল সেসময়ের মানুষের অজানা। কিন্তু তাদের মনে প্রশ্ন ছিলো, আর সবসময় ধর্ম যা করে ঠিক তেমনভাবে অজানা এ প্রশ্নটির উত্তরে আল্লাহকে আমদানি সেখানেই সঠিক উত্তর খোঁজার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন নবীজি!

যারা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোকে বিজ্ঞানের মোড়কে পুরতে চান, তারা কি এই আয়াতগুলোর কথা জানেন না? অবশ্যই জানেন। জানার পর তারা একটি মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে মনকে শান্ত করেন। অনেকে আবার সেগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করেন। আর এখানেই আমাদের আপত্তি। কেবলমাত্র কোরআনে নয়, অন্য সকল অলৌকিক গ্রন্থেও আমরা নিশ্চল এবং স্থির পৃথিবীর ধারণা পাই।

বাইবেল বলে-

> 'আর জগৎও অটল- তা বিচলিত হবে না' (ক্রনিকলস ১৬/৩০)
> 'জগৎ ও সুস্থির, তা নড়াচড়া করবে না।' (সাম ৯৩/১)
> 'তিনি পৃথিবীকে অনড় এবং অচল করেছেন' (সাম ৯৬/১০)
> 'তিনি পৃথিবীকে এর ভিত্তিমূলের উপর স্থাপন করেছেন, তা কখনো বিচলিত হবে না' (সাম ১০৪/৫) ইত্যাদি।

একইভাবে বেদেও রয়েছে-

> 'ধ্রুবা দৌধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে।' (ঋগ্বেদ দশম মণ্ডল, ১৭৩/৪)
> অর্থাৎ, 'আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিশ্চল, এ সমস্ত পর্বতও নিশ্চল'।

ঋগ্বেদের আরেকটি শ্লোকে রয়েছে-

> 'সবিতা যৈন্ত্রঃ পৃথিবীমরন্মা-দগ্ধন্তনে সবিতা দ্যামদৃং হত।' (ঋগ্বেদ দশম মণ্ডল, ১৪৯/১)
> অর্থাৎ 'সবিতা নানা যন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীকে সুস্থির রেখেছেন- তিনি বিনা খুঁটিতে আকাশকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছেন।'

উপরের শ্লোকটি একটি বিশেষ কারণে আরো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। এটি থেকে বোঝা যায়, বৈদিক যুগে মানুষেরা পৃথিবীকে তো স্থির ভাবতেনই, আকাশকে ভাবতেন পৃথিবীর ছাদ। তারা ভাবতেন ঈশ্বরের অপার মহিমায় এই খুঁটিবিহীন ছাদ আমাদের মাথার উপরে ঝুলে রয়েছে। কোরআনের সুরা লুকমানে (৩১:১০) বর্ণনা আছে এইভাবে-

> 'তিনিই খুঁটি ছাড়া আকাশকে ছাদ স্বরূপ ধরে রেখেছেন ...'

---

1 ***Volume 4, Book 54, Number 421:*** Narrated Abu Dhar:

The Prophet asked me at sunset, 'Do you know where the sun goes (at the time of sunset)?' I replied, 'Allah and His Apostle know better.' He said, 'It goes (i.e. travels) till it prostrates Itself underneath the Throne and takes the permission to rise again, and it is permitted and then (a time will come when) it will be about to prostrate itself but its prostration will not be accepted, and it will ask permission to go on its course but it will not be permitted, but it will be ordered to return whence it has come and so it will rise in the west. And that is the interpretation of the Statement of Allah: 'And the sun Runs its fixed course For a term (decreed). that is The Decree of (Allah) The Exalted in Might, The All-Knowing.' (36.38)

Volume 6, Book 60, Number 326: Narrated Abu Dharr:

Once I was with the Prophet in the mosque at the time of sunset. The Prophet said, 'O Abu Dharr! Do you know where the sun sets?' I replied, 'Allah and His Apostle know best.' He said, '**It goes and prostrates underneath (Allah's) Throne**; and that is Allah's Statement:

'And the sun runs on its fixed course for a term (decreed). And that is the decree of All-Mighty, the All-Knowing....' (36.38)

Volume 6, Book 60, Number 327: Narrated Abu Dharr:

I asked the Prophet about the Statement of Allah: 'And the sun runs on fixed course for a term (decreed),' (36.38) He said, '**Its course is underneath 'Allah's Throne**.' (Prostration of Sun trees, stars. mentioned in Qur'an and Hadith does not mean like our prostration but it means that these objects are obedient to their Creator (Allah) and they obey for what they have been created for).

কিন্তু আজ এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগে আমরা জানি, আকাশ কখনোই পৃথিবীর ছাদ নয়। সত্যিকার অর্থে তো আকাশ বলেই কিছু নেই। আকাশ হচ্ছে আমাদের দৃষ্টির প্রান্তসীমা। পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল থাকার কারণে আমাদের চোখে আকাশকে নীল দেখায়। চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই, তাই চাঁদের আকাশ কালো। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, 'মহাবিজ্ঞানময়' কিতাবগুলোতেও এধরনের কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান পাওয়া যায় না। মানুষ কবে বড় হবে? ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে মুখ সরিয়ে কবে সত্যি সত্যিই একদিন বুঝতে শিখবে 'আকাশ' শব্দটার মানে? সুনীলের কবিতার 'একটা গাছ তলায় দাঁড়িয়ে' কবিতার কয়েকটি লাইন এ প্রসঙ্গে খুবই অর্থবহ–

... এতগুলো শতাব্দী গড়িয়ে গেল, মানুষ তবু ছেলেমানুষ রয়ে গেল
কিছুতেই বড় হতে চায় না
এখনো বুঝলো না 'আকাশ' শব্দটার মানে
চট্টগ্রাম বা বাঁকুড়া জেলার আকাশ নয়
মানুষ শব্দটাতে কোনো কাঁটাতারের বেড়া নেই
ঈশ্বর নামে কোনো বড় বাবু এই বিশ্ব সংসার চালাচ্ছেন না
ধর্মগুলো সব রূপকথা
যারা এই রূপকথায় বিভোর হয়ে থাকে
তারা প্রতিবেশীর উঠোনের ধুলোমাখা শিশুটির কান্না শুনতে পায় না
তারা গর্জন বিলাসী ...

পৃথিবী আসলে সমতল

আমার নিবন্ধটি সেই অনলাইন পত্রিকাটিসহ অন্যান্য জায়গায় প্রকাশের পর বেশ কিছু প্রতিক্রিয়া হয়। আমার এক ধার্মিক বান্ধবী ই-মেইলে জানায়, "হতে পারে কোরআনে কোথাও বলা নাই যে 'পৃথিবী ঘুরছে'। কোরআনে তো কতকিছুই সোজাসুজি বলা নাই। যেমন, কোরআনে তো এ কথাও বলা নাই যে 'পৃথিবী গোলাকার'। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে কোরআনের দৃষ্টিতে পৃথিবী সমতল।''

উত্তরে আমি জানালাম, কোরআনের দৃষ্টিতে পৃথিবী সত্যিই সমতল! নিম্নোক্ত এই সুরাগুলো তার প্রমাণ-

' ... পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি (কার্পেটের মতো) এবং ওতে পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি ...' (১৫:১৯)

'যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে (সমতল) শয্যা করেছেন এবং ওতে তোমাদের জন্য চলার পথ দিয়েছেন ...' (২০:৫৩, যুখরুখ ৪৩:১০)

' আমি বিস্তৃত করেছি (কার্পেটের মতো) পৃথিবীকে এবং ওতে পর্বত মালা স্থাপন করেছি ...' (৫০:৭)

'আমি ভূমিকে বিছিয়েছি, আর তা কত সুন্দর ভাবে বিছিয়েছি ...' (৫২:৪৮)

'আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত ...' (৭১:১৯) ইত্যাদি।

উপরের আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায়, পদার্থবিদরা যেভাবে আজ গোলাকার পৃথিবীর ধারণা পোষণ করেন, কোরআনের পৃথিবী তার সাথে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সমতলভাবে বিস্তৃত পৃথিবীর কথা বোঝানোর জন্য যত রকমের শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে তার প্রায় সবই কোরআনে ব্যবহৃত হয়েছে।

শব্দগুলো হচ্ছে ফিরাশা, মাদ্দা, মাদাদনা, মাহ্‌দা, মাদাদনাহা, ফারাশনা, আল-মাহিদুন, বিসাতা, মিহাদা, দাহাহা[2], সুতিহাত এবং তাহাহা। একই ধরনের শব্দ বিভিন্ন পদে ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলো সবই সমতল পৃথিবীর স্বরূপকেই তুলে ধরে[3]। আমি এই প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত সুরা কাহাফ (১৮:৮৬) এর প্রতি আবারও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যেখানে বলা আছে আল্লাহর এক বিশ্বস্ত বান্দা কাদামাটি পূর্ণ একটি নির্দিষ্ট স্থানে সূর্যকে ডুবতে দেখেছিলেন। একই সুরার ৯০ নং আয়াতে একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে সূর্যোদয়েরও বর্ণনা আছে। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে আল্লাহ কেন ভাবলেন যে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান দরকার? এর মধ্য থেকে একটি সত্যিই বেরিয়ে আসে, আর তা হলো কোরআনের গ্রন্থাকার পৃথিবীকে গোলাকার ভাবেননি, ভেবেছেন সমতল।

নামাজ পড়ার নির্দিষ্ট সময়ের কথা মাথায় রাখলে পরিষ্কার বোঝা যায় প্রাচীন কালে মানুষের মতো আল্লাহও সমতল পৃথিবীর ধারণা থেকে একদমই বেরুতে পারেন নি। আমাদের বাঙালি কৃষক-দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর তার 'সত্যের সন্ধান' বইতে চমৎকারভাবে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন। এই সুযোগে সেটা আবার একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। ইসলামি শাস্ত্রে প্রত্যেকদিন পাঁচবার নামাজ পড়ার বিধান আছে। এই পাঁচবারের জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ আছে, আবার কোনো কোনো সময়ে নামাজ পড়া আবার নিষিদ্ধ। যেমন, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত অথবা মধ্যাহ্নে নামাজ পড়ার কোনো নিয়ম নেই। কিন্তু পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে আমরা জানি যেকোনো স্থির মুহূর্তে বিভিন্ন দ্রাঘিমার উপর বিভিন্ন সময় দেখা দেয় এবং প্রতিমুহূর্তেই পৃথিবীর কোনো না কোনো স্থানে নির্দিষ্ট উপাসনা চলতে থাকে। এর মানে কী? যেমন ধরা যাক, বরিশালে যখন সূর্যোদয় হচ্ছে, তখনও কলকাতায় সূর্য উঠে নি আর চট্টগ্রামে কিছুক্ষণ আগেই সূর্য উঠে গেছে। কাজেই বরিশালে যখন ইসলামের দৃষ্টিতে নামাজ পড়া হারাম, তখন কলকাতা বা চট্টগ্রামে তা হারাম নয়। তা হলে নির্দিষ্ট সময়ে উপাসনা নিষিদ্ধ করার কোনো মানে আছে? যুক্তিবাদী আরজ আলী 'সত্যের সন্ধানে' বইতে একটি মজার প্রশ্ন করেছেন। ধরা যাক একজন লোক বেলা দেড়টায় জোহরের নামাজ পড়ে বিমানে চড়ে মক্কায় যাত্রা করলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি দেখলেন যে ওখানে তখনও দুপুর হয় নি। ওখানে জোহরের ওয়াক্তের সময় হলে কি তার আরেকবার জোহরের নামাজ পড়তে হবে? আপাত নিরীহ এই প্রশ্নটির মধ্যেই কিন্তু উত্তরটি লুকিয়ে আছে। আরজ আলী নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন-

> এক সময় পৃথিবীকে স্থির আর সমতল মনে করা হতো। তাই পৃথিবীর সকল দেশে বা সকল জায়গায় একই রকম সময় সূচিত হবে, বোধহয় এইরকম ধারণা থেকে ওই সমস্ত নিয়ম-কানুন প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু এখন প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবী গোল ও গতিশীল।

আসলে আধুনিক জীবন-যাত্রার সাথে তাল মেলাতে পুরোনো ধর্মীয় কানুন মানতে গিয়ে দেখা দিচ্ছে নানা জটিলতা। ভবিষ্যতে এই জটিলতা আরও বাড়বে। যেমন, কোনো নভোচারী অথবা কোনো বিমান চালক ১০৪১.৬৭ মাইল বেগে পশ্চিম দিকে বিমান চালালে সূর্যকে সবসময়ই তার কাছে গতিহীন বলে মনে হবে। অর্থাৎ বিমান আরোহীদের কাছে সকাল, দুপুর আর সন্ধ্যা বলে কিছু থাকবে না- সূর্য যেন স্থিরভাবে একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই অবস্থায় বিমান আরোহীদের নামাজ-রোজার উপায় কী? ভবিষ্যতে মেরু

---

2 অনেক ইসলামিস্ট সাম্প্রতিককালে 'দাহাহা' শব্দের অর্থ করার চেষ্টা করেছেন, উট পাখির ডিম বা উট পাখির ডিমের মতো আকৃতির। তারা বলেন, এই আয়াতে দাহাহা দ্বারা বিস্তৃত করা বোঝানো হয়নি (যদিও পাঠক খেয়াল করলেই দেখবেন যে, অন্য সকল স্থানে কিন্তু বিস্তৃত করাই বোঝানো হয়েছে, এবং ইউসুফ আলী কিংবা পিকথালের অনুবাদে expanding অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে)। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে, গোলাকার তথা উট পাখির ডিমের মতো করে তৈরী করা। কারণ হিসেবে এই ইসলামিক স্কলাররা বলছেন, দাহাহা শব্দের মূল হলো 'দুহিয়া' যার অর্থ উট পাখির ডিম। এটা যে কষ্টকল্পিত আর জোড়াতালি ব্যাখ্যা তা না বললেও বোধ হয় চলবে। এখানে 'দাহাহা'র সাথে উট পাখির ডিমের সম্পর্ক কোনোভাবেই করা যায় না। আরবি অভিধান ঘাঁটলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ডিমের আরবি হলো আল বাইজা, দুহিয়া নয়। তারপরও অনেকে ডিম নিয়ে পড়ে থাকতে চান, আর মানুষকে প্রতারিত করেন। যদি ডিমের ব্যাপারটি সঠিক বলে ধরেও নেই, তারপরেও তাদের যুক্তি ধোপে টেকে না। পৃথিবীর আকৃতি আসলে ডিমের মতো না। এমনকি স্কুলের ভূগোল বইয়েই পাওয়া যায় পৃথিবীর আকৃতি অনেকটা কমলালেবুর মতো– উত্তর দক্ষিণে খানিকটা চাঁপা। এধরণের আকৃতিকে বলে oblate (বিষুব বরাবর প্রসারিত)। আর অন্য দিকে ডিমের আকৃতি উত্তর দক্ষিণে ছুঁচালো, কারণ ডিম হলো prolate আকৃতির (মেরু বরাবর প্রসারিত)। এপ্রসঙ্গে আরো জানার জন্য উইকি ইসলাম থেকে দেখুন, The Flat Earth, http://wikiislam.net/wiki/The_Flat_Earth

3 এ প্রসঙ্গে আরো পড়ুন, খান মুহাম্মদ (শিক্ষানবিস), ইসলামী বিজ্ঞানের পৌরাণিক কাহিনি, মুক্তমনা।

অঞ্চলের কাছাকাছি যদি বসতি গড়তে হয়, তবে দেখা দেবে আরও এক সমস্যা। সেখানে প্রায় ছয় মাস থাকে দিন আর ছয় মাস থাকে রাত। সেখানে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা রাখা আর দিনে পাঁচ বার নামাজ পড়া কি আদৌ সম্ভব? এটি বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে, প্রাচীনকালে মানুষের সমতল পৃথিবী ব্যাপারে ভুল ধারণার কারণেই আজকের দিনে নিয়ম পালনে এই জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

ইতিহাসের পাতায় এবার চোখ রাখা যাক। এগারো শতকের বিখ্যাত আরবীয় বিজ্ঞানী ইবন-আল হাইথাম ধারণা করেছিলেন যে পৃথিবী সমতল নয়, বরং গোলাকার। তার সমস্ত কাজ সেসময় ধর্মবিরোধী বলে বাজেয়াপ্ত করা হয়, আর তার সমস্ত বইও পুড়িয়ে দেওয়া হয়[4]। এই তো সেদিন- ১৯৯৩ সালে, সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা শেখ আবদেল আজিজ ইবন বা'জ এই বলে একটি ফতোয়া জারি করেন-

'এই পৃথিবী সমতল। যারা এই সত্যটা মানে না তারা সকলেই নাস্তিক, শাস্তিই তাদের কাম্য।'

কার্ল স্যাগানের 'The Demon-Haunted World' বইয়ে এই বিখ্যাত ফতোয়ার উল্লেখ পাওয়া যাবে[5]।

হিন্দু পুরাণগুলোর অবস্থাও তথৈবচঃ। নরসিংহ পুরাণের ১৬৯ পৃষ্ঠায় সমতল পৃথিবীর পরিষ্কার বর্ণনা আছে। তাই গুজরাটে বারোদায় 'জাম্বুদ্বিপা' নামের একটি প্রতিষ্ঠান এখনো বৈদিক সমতল পৃথিবীকে 'বৈজ্ঞানিকভাবে' প্রমাণ করার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯৯৯ সালের ১৫ ই সেপ্টেম্বর কেনসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টিম মিলার দাবি করলেন যে, 'বাইবেল অনুযায়ী, পৃথিবীর চারটি প্রান্ত আছে।' এবং তিনি আরও দাবি করলেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন পৃথিবী আসলে হয় চতুর্ভুজ আকৃতির অথবা আয়তাকার। আসলে কোরআন, বাইবেল আর বেদের মতো ধর্মগ্রন্থে লেখা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কিছু মানুষ এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও মনে করে পৃথিবী গোলাকার নয়, সমতল। তারা 'আন্তর্জাতিক সমতল পৃথিবী সমিতি' (International Flat Earth Society[6]) এবং 'আন্তর্জাতিক চতুর্ভূজাকার পৃথিবী সমিতি' (The International Square Earth Society[7]) এধরনের হাস্যকর সমস্ত নামে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুলেছে যাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে পৃথিবীবাসীকে বোঝানো যে, বিজ্ঞান যাই বলুক না কেন, পৃথিবী কিন্তু সমতল!

ভুল করে ভুল করা

তথ্যগত ভুল কিংবা প্রাচীন চিন্তাধারার নিদর্শন রয়েছে কোরআন শরীফে। ভ্রান্ত 'সমতল' এবং 'অনড়' পৃথিবীর ধারণাই কেবল নয়, এখানে আছে অদৃশ্য 'শয়তান জ্বীন' এর উপস্থিতির উল্লেখ (৬:১০০, ৬:১১২, ৬:১২৮, ৬:১৩০, ৭:৩৮, ১১:১১৯, ১৫:২৭ ইত্যাদি), যাদের কাজ হচ্ছে একজনের উপর আরেকজন দাঁড়িয়ে 'Exalted Assembly' তৈরি করা (৩৭:০৮) আর কানাকানি করে গোপন কথা শুনে ফেলা (৭২: ৮, ৩৭: ৬/১০)। আকাশে আমরা উল্কাপাত ঘটতে দেখি কারণ এই অদৃশ্য শয়তান এবং জ্বীনদের ভয় দেখানোর জন্যই আল্লাহ এমনটা ঘটান (৭২: ৯, ৩১: ১০)। কীভাবে জুলকারনাইন এক

4 T.J. de Boer তার History of Philosophy in Islam (1904) বইয়ে বলেছেন যে, পৃথিবীকে গোলাকার হিসবে বিবেচনা করে হাইথাম অপবিত্র নাস্তিকের প্রতীকে (unhappy symbol of impious Atheism) পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন, এবং তার কাজকর্ম জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। এছাড়া Bradley Steffens এর Ibn al-Haytham: First Scientist বইয়েও হাইথামের পান্ডুলিপি পোড়ানোর উল্লেখ পাওয়া যায়।

5 যদিও ফতোয়াটি নিয়ে কিছুটা বিতর্ক আছে, কারণ শেখ আবদেল আজিজ ইবন বা'জ পরে ফতোয়া দেওয়ার ব্যাপারটি অস্বীকার করেন। কিন্তু এখনো অন্ততঃ তিনটি জায়গায় ফতোয়াটির উল্লেখ পাওয়া যায়- কার্ল স্যাগেনের ' The Demon-Haunted World' (১৯৯৬ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩২৫), অধ্যাপক পারভেজ হুদোভয়ের Islam and Science: Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality (পৃষ্ঠা ৪৯) এবং New York Times এর 1995 সালে প্রকাশিত Yousef M. Ibrahim এর প্রবন্ধ Muslim Edicts take on New Force (The New York Times, February 12, 1995)

6 বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন- The Flat-out Truth: The idea of a spinning globe is only a conspiracy of error that Moses, Columbus, and FDR all fought... http://www.lhup.edu/~dsimanek/fe-scidi.htm

7 বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন-The International Square Earth Society, http://pw1.netcom.com/~rogermw/square_earth.html

'পঙ্কিল জলাশয়ে' সূর্যকে ডুবতে দেখেছেন, তার উল্লেখ যে কোরআনে আছে, তা তো এ অধ্যায়ের আগেই বলেছি। এধরনের ভুল আরো আছে। যেমন, বলা আছে শুক্রাণু তৈরি হয় মেরুদণ্ড এবং পাঁজরের মধ্যবর্তী জায়গা থেকে (৮৬:৬-৭); মাতা মেরিকে বর্ণনা করা হয়েছে অ্যারনের (মুসার বড় ভাই) বোন হিসেবে (১৯:২৮)। এগুলো সঠিক নয়। আর হাদিসে বলা হয়েছে যে, যখন কোনো পুরুষের শুক্রাণু কোনো মহিলার জরায়ুতে প্রবেশ করে, তখন আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত ফেরেশতারা তার দায়িত্ব নিয়ে নেয় (সহি বোখারি ১.৬.৩১৫, ৪.৫৪.৪৩০; সহি মুসলিম ৩৩.৬৩৯২ ইত্যাদি), মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো 'ইসলামি পাপ বয়ে নিয়ে যায়' (সুনান নাসাই ১.১৪৯), এমন কি কোরআন-হাদিস অনুযায়ী মানব অঙ্গগুলো কথা পর্যন্ত বলতে পারে (কোরআন ৪১:২০, ৪১:২১, ৩৬:৬৫, ২৪:২৪)। তাও না হয় মানা গেল, কিন্তু হাদিসে উটের মূত্রকে যে রোগনাশকারী মহৌষধ হিসেবে বর্ণনা করে তা নিয়মিতভাবে পান করার পরামর্শ যে দেয়া হয়েছে, তা কি আমরা জানি? যেমন, সহি বোখারির ভলিউম ৭, বই ৭১, হাদিস নং ৫৯০ দেখা যাক-

> আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
> কিছু লোকের মদিনার আবহাওয়া প্রতিকূল মনে হচ্ছিল। রাসুল (সাঃ) তাদেরকে নির্দেশ দিলেন উটের রাখালের সাথে বাস করতে এবং উটের দুধ ও মূত্র খেতে (ঔষধ হিসেবে)। তারা রাখালের সাথে থাকতে লাগলো এবং উটের দুগ্ধ এবং মূত্র পান করতে লাগলো যতদিন পর্যন্ত না তারা সুস্থ হয়ে ওঠে। এরপর তারা রাখালকে মেরে তার উট নিয়ে পালাতে লাগলো। খবর পেয়ে রাসুল (সাঃ) তাদেরকে ধরে আনতে বললেন। তাদেরকে রাসুলের সামনে উপস্থাপন করার পর তিনি তাদের হাত পা কেটে এবং চোখে লৌহ তপ্ত শলাকা ঢুকিয়ে হত্যা করার আদেশ দিলেন।

উটের দুধের পাশাপাশি মূত্রপানের উপকারিতার কথা বলা আছে আরো অনেক হাদিসেই, এবং ইবনে ইসহাকের সিরাতেও[8]।

কোরআনের কয়েকটি আয়াত থেকে পাওয়া যায়, এই মহাবিশ্ব তৈরি করতে আল্লাহ সময় নিয়েছেন ছয় দিন (৭:৫৪, ১০:৩, ১১:৭, ৫০:৩৮, ৫৭:৪ ইত্যাদি), কিন্তু ৪১:৯-১২ থেকে জানা যায়, তিনি পৃথিবী তৈরি করতে ২ দিন সময় নিয়েছিলেন, এরপর এর মধ্যে পাহাড়-পর্বত বসাতে আর অন্যান্য আনুষঙ্গিক ইমারত তৈরি করতে আরো চার দিন, সবশেষে সাত আসমান বানাতে সময় নিয়েছেন আরো দু-দিন। সব মিলিয়ে সময় লেগেছে মোট আট দিন। কাজেই কোরআন অনুযায়ী আল্লাহ মহাবিশ্ব বানিয়েছেন কয় দিনে- ছয় দিনে নাকি আট দিনে? সুরা ৭৯:২৭-৩০ অনুযায়ী আল্লাহ 'বেহেশত' বানিয়েছিলেন আগে, তারপর বানিয়েছিলেন পৃথিবী, কিন্তু অন্য কিছু আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, আগে পৃথিবী পরে বেহেশত (২:২৯ এবং ৪১: ৯-১২ দ্রঃ)। কখনো বলা হয়েছে আল্লাহ সবকিছু ক্ষমা করে দেন (৪: ১১০, ৩৯: ১৫৩) কিন্তু আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, তিনি সবকিছু ক্ষমা করেন না (৪:৪৮, ৪:১১৬, ৪:১৩৭, ৪:১৬৮)। সুরা ৩:৮৫ এবং ৫:৭২ অনুযায়ী ইসলাম ধর্মে যারা নিজেদের সমর্পন করে নি তারা সবাই দোজখে যাবে তা সে খ্রিস্টান, ইহুদি, পেগান যেই হোক না কেন, কিন্তু আবার ২:৬২ এবং ৫:৬৯ অনুযায়ী, ইহুদি এবং

---

8 1) *Narrated Anas:Some people from the tribe of 'Ukl came to the Prophet and embraced Islam. The climate of Medina did not suit them, so the Prophet ordered them to go to the (herd of milch) camels of charity and to drink, their* ***milk and urine*** *(as a medicine).* Sahih Bukhari 8:82:794

2) *Anas b. Malik reported that some people belonging (to the tribe) of 'Uraina came to Allah's Messenger (may peace be upon him) at Medina, but they found its climate uncongenial. So Allah's Messenger (may peace be upon him) said to them: If you so like, you may go to the camels of Sadaqa and drink their* ***milk and urine****. They did so and were all right.* Sahih Muslim 16:4130

3) *'A tradtionalist told me from one who had told him from Muhammad b. Talha from Uthman v. Abdul-Rahman that in the raid of Muharib and B. Thalaba the apostle had captured a slave called Yasar, and he put him in charge of his milch-camels to shepherd them in the neighborhood of al-Jamma. Some men of Qays of Kubba of Bajila came to the apostle suffering from an epidemic and enlarged spleens, and the apostle told them that if they went to the milch camels and drank their* ***milk and their urine*** *they would recover, so off they went.* From The Sirat Rasul Allah (The Life of The Prophet of God), by Ibn Ishaq pages 677- 678

খ্রিস্টানদের সবাই দোজখে যাবে না। কখনো বলা হয়েছে মুহাম্মদকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত আছেন এক হাজার জন ফেরেশতা (৮:৯-১০) কখনোবা বলেছেন এই সাহায্যকারী ফেরেশতাদের সংখ্যা আসলে তিনহাজার (৩: ১২৪, ১২৬)। কখনো আল্লাহ বলেছেন তার একটি দিন পার্থিব এক হাজার বছরের সমান (২২:৪৭, ৩২:৫), কখনোবা বলেছেন, তার দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান (৭০:৪)। মানব সৃষ্টি নিয়েও আছে পরস্পর-বিরোধী তথ্য। আল্লাহ কোরআনে কখনো বলেছেন তিনি মানুষ বানিয়েছেন পানি থেকে (২৫:৫৪, ২৪:৪৫), কখনোবা জমাট রক্ত বা 'ক্লট' থেকে (৯৬:১-২), কখনোবা কাদামাটি থেকে (১৫:২৬, ৩২:৭, ৩৮:৭১, ৫৫:১৪) আবার কখনোবা 'ডাস্ট' বা ধূলা থেকে (৩০:২০, ৩৫:১১) ইত্যাদি। একই সাথে এত ধরনের তথ্য ঠিক কোন অর্থ প্রকাশ করে?

পৌরাণিক বিগব্যাঙ

আবারও ফিরে আসি বিজ্ঞানময় কিতাবের জগতে। ফিরে আসতেই হয় বারে বারে- বুকাইলি, হারুন ইয়াহিয়া আর মুরদের কল্যাণে। সোজা হয়ে প্রশ্নটার মুখোমুখি দাঁড়াতেই হয় অবশেষে- 'সত্যিই কি কোরআন অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত আর মহা-বিজ্ঞানময় এক নিখুঁত ঐশী কিতাব?' বব ডিলানের বাংলা করে সুমন যেভাবে গেয়েছে, সেভাবেই বলি- 'প্রশ্নগুলো সহজ, আর উত্তরও তো জানা।' উত্তর হচ্ছে- মোটেই কোরআন অলৌকিক কোনো গ্রন্থ নয়। কোরআনে আসলে কোথাও বিগব্যাঙের কথা নেই, রিলেটিভিটির কথা নেই, কৃষ্ণগহ্বরের কথা নেই, অণু-পরমাণুর কথাও নেই। বিগব্যাঙ আর রিলেটিভিটির নামে যা দেখা যায়, তা হলো আদিম সুরাগুলোর 'আধুনিক' এবং 'চতুর' ব্যাখ্যা। নিচের উদাহরণটি দেখা যাক-

> অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না, আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম (২১:৩০)

'কিতাব-বিশেষজ্ঞ' এর দল এই আয়াতটির মধ্যে বিগব্যাঙের গন্ধ খুঁজে পান। কিন্তু আসলেই কি এর মধ্যে বিগব্যাঙের কোনো আলামত আছে? একটু যৌক্তিক মন নিয়ে আলোচনা করা যাক। এই আয়াত এবং তার পরবর্তী আয়াতগুলোর দিকে তাকানো যাক-

> 'আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম' (২১:৩০)
>
> 'এবং আমি এ জন্য পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি, যেন তা সহ এটি না নড়ে।' (২১:৩১)
>
> 'এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ' (২১:৩২)
>
> 'আল্লাহই ঊর্ধ্ব দেশে স্তম্ভ ছাড়া আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন' (১৩:২)

এই আয়াতগুলো আমাদের আকাশ আর পৃথিবীর মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে আসলে খুব প্রাচীন আর অস্পষ্ট একটি ধারণা দেয়। আল্লাহ আকাশকে 'স্তম্ভ বিহীন' ছাদ হিসেবে স্থাপন করার পর পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করলেন যাতে কিনা আমাদের এ পৃথিবী না নড়ে, ঠিক যেমনটি আমরা পাতলা কোনো কাগজ বাতাসে উড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ওটাকে পেপার-ওয়েট দিয়ে চাপা দেই। আল্লাহ মানুষের মাথায় 'আকাশ ভেঙ্গে পড়ার' হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কী করলেন? আকাশকে অদৃশ্য খুঁটির উপর বসিয়ে দিলেন। এগুলো কী করে বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলামত হয়? আর সবচেয়ে বড় কথা, 'আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম'- এই আয়াতটি যদি মহা-বিস্ফোরণের (বিগব্যাঙ) প্রমাণ হয়, তবে কোথায় এখানে বিস্ফোরণের উল্লেখ? 'বিগব্যাঙ' শব্দটি নিজেই এখানে তাৎপর্যবাহী। এই আয়াতের কোথায় রয়েছে সেই বিখ্যাত 'ব্যাঙ' (বিস্ফোরণ) এর ইঙ্গিত?

উপরন্তু, পদার্থবিজ্ঞানে 'বিগব্যাঙ' স্থান-কাল অদ্বিতীয়ত্বের (space-time singularity) সাথে জড়িত, পদার্থের সাথে নয়। বিগব্যাঙের প্রক্রিয়া যখন শুরু হয়েছিল তখন পৃথিবীর অস্তিত্বই ছিল না, পৃথিবীর জন্ম হয়েছে বিগব্যাঙের সাড়ে নয়শ কোটি বছর পরে। উপরের আয়াতটি শুধু আকাশ ও পৃথিবী একসাথে 'মিশে থাকার' (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যার কোনো অর্থই হয় না) কথাই বলছে আর পরে বলছে উভয়কে 'পৃথক করে' (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আবারও যার কোনো অর্থ নেই) দেওয়ার কথা যা বৈজ্ঞানিক বক্তব্য হতে পারে না, বিগব্যাঙ তো অনেক পরের কথা।

কতগুলো অর্থহীন শব্দমালা- 'আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম' কখনোই বৈজ্ঞানিকভাবে 'বিগব্যাঙ'কে প্রকাশ করে না[9]। কোয়ান্টাম পদার্থ-বিজ্ঞান থেকে আমরা জানি, মহাবিস্ফোরণ-মুহূর্তে প্রকৃতির চারটি বল- শক্তিশালী নিউক্লিয় বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল, তড়িৎ-চুম্বকীয় বল আর মাধ্যাকর্ষণ বল 'একীভূত শক্তি' (super force) হিসেবে প্রকৃতিতে বিদ্যমান ছিল। উপরের আয়াতটিতে কোথায় তার ইঙ্গিত? কীভাবে একজন ওই আয়াতটি থেকে হাবলের ধ্রুবক বের করতে পারবে? কীভাবে মাপতে পারবে ডপলারের বিচ্যুতি? উত্তর নেই।

জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণার দিকে খানিকটা চোখ বুলানো যাক। অ্যালেন গুথ এবং আঁদ্রে লিন্ডের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে পাওয়া ফলাফল থেকে জানা গিয়েছে, আমাদের মহাবিশ্ব যদি কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে স্থান-কালের শূন্যতার ভিতর দিয়ে আবির্ভূত হয়ে থাকে, তবে এ পুরো প্রক্রিয়াটি কিন্তু একাধিকবার ঘটতে পারে, এবং হয়তো বাস্তবে ঘটেছেও। ব্যাপারটিকে বলে মাল্টিভার্স বা 'অনন্ত মহাবিশ্বের' ধারণা[10]। এ ধারণায় মনে করা হয়, কেওটিক ইনফ্লেশনের মাধ্যমে সম্প্রসারিত বুদ্বুদ (Expanding Bubbles) থেকে আমাদের মহাবিশ্বের মতোই অসংখ্য মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে, যেগুলো একটা অপরটা থেকে সংস্পর্শবিহীন অবস্থায় দূরে সরে গেছে। এধরনের অসংখ্য মহাবিশ্বের একটিতেই হয়তো আমরা অবস্থান করছি (পকেট মহাবিশ্ব) অন্যগুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারেই জ্ঞাত না হয়ে। সম্প্রতি অনন্ত মহাবিশ্বের স্বপক্ষে কিছু পরীক্ষালব্ধ প্রমাণও পাওয়া গেছে[11]।

কাজেই, বিজ্ঞানের চোখে বিগব্যাঙই শেষ কথা নয়। বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো বিগব্যাঙ-এর আগে কী ছিল তারও একটি সার্বিক উত্তর খুঁজতে সচেষ্ট হয়েছে। আসলে ইনফ্লেশন বা স্ফীতি নিয়ে আঁদ্রে লিন্ডে আর তার দলবলের সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে সত্যিকার অর্থেই সেই 'উত্তপ্ত বিগব্যাঙ'- যার মধ্য দিয়ে এ মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, তাকে বিদায় জানানোর সময় এসে গিয়েছে। কারণ, সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, বিগব্যাঙ দিয়ে মহাবিশ্বের শুরু নয়, বরং মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে ইনফ্লেশন দিয়ে। অর্থাৎ, বিগব্যাঙের পরে ইনফ্লেশনের মাধ্যমে মহাবিশ্ব তৈরি (যা কিছুদিন আগেও সত্যি বলে ভাবা হতো) হয় নি, বরং ইনফ্লেশনের ফলশ্রুতিতেই কিন্তু বিগব্যাঙ হয়েছে, তারপর সৃষ্টি হয়েছে আমাদের মহাবিশ্ব। আঁদ্রে লিন্ডের কথায়[12]-

> ১৫ বছর আগেও আমরা ভাবতাম ইনফ্লেশন হচ্ছে বিগব্যাঙ-এর অংশ। এখন দেখা যাচ্ছে বিগব্যাঙ-ই বরং ইনফ্লেশনারি মডেলের অংশবিশেষ।

এখন কথা হচ্ছে, বিগব্যাঙ- এর মডেল কখনো ভুল প্রমাণিত হলে কিংবা পরিবর্তিত/পরিশোধিত হলে কী হবে? সাথে সাথে কি ধার্মিকেরাও বিগব্যাঙ-এর সাথে 'সঙ্গতিপূর্ণ' আয়াতকে বদলে ফেলবেন? তাহলে তখন 'আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল'- এই আপ্তবাক্যের কী হবে? এই ধরনের আশংকা থেকেই

---

9 আসলে কোরআনে কেন আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে থাকার কথা আছে তা সহজেই অনুমেয়। সেসময় প্যাগানসহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক গোত্রের উপকথা এবং লোককথাতেই আকাশ আর পৃথিবী মিশে থাকার আর হরেক রকমের দেব-দেবী দিয়ে পৃথক করার কথা বলা ছিল। যেমন মিশরের লোককথায় 'গেব' নামের এক দেবতা ছিলেন যিনি ছিলেন মৃত্তিকার দেবতা। এই গেবকে তার মা এবং বোন (আসমানের দেবী) থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ফলেই আকাশ আর পৃথিবী একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আবার, সুমেরীয় উপকথা গিলগামেশের কাহিনিতেও আসমানের দেবী 'অ্যান'কে মৃত্তিকার দেবতা 'কী' এর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার কথা বলা আছে। এ সমস্ত উপকথা থেকে প্যাগান রেফারেন্সগুলো বাদ দিলে যা রইবে, তা কোরআনেরই কাহিনি।

10 এ প্রসঙ্গে পড়ুন, অভিজিৎ রায়, অনন্ত মহাবিশ্বের সন্ধানে, সচলায়তন এবং মুক্তমনা।

11 অভিজিৎ রায়, মাল্টিভার্স : অনন্ত মহাবিশ্বের খোঁজে, মুক্তমনা, ১৩ পৌষ ১৪১৭ (ডিসেম্বর ২৭ th, ২০১০)

12 Self Reproducing Inflationary Universe, Andrei Linde, Scientific American, 1998

কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন বিশ্বাসী পদার্থবিজ্ঞানী আব্দুস সালাম জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানের বিগব্যাঙ তত্ত্বকে কোরআনের আয়াতের সাথে মেশাতে বারণ করতেন। তিনি বলতেন[13]-

> বিগব্যাঙ তত্ত্বের সাম্প্রতিক ভাষ্যটি বর্তমানে মহাবিশ্বের উৎপত্তির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করছে। কিন্তু আগামীকাল যদি এর চাইতেও কোনো ভালো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহলে কী হবে? তাহলে কি নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তাল মেলাতে গিয়ে ধর্মগ্রন্থের আয়াত বদলে ফেলা হবে?

খুবই যৌক্তিক শঙ্কা। ঠিক একই কারণে ১৯৫১ সালে যখন Pope Pius XII বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে বিগব্যাঙ বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের মিল খুঁজে পেলেন, তখন জ্যোর্তিবিজ্ঞানী এবং খ্রিস্টান ধর্মযাজক জর্জ হেনরি লেমিত্রি (যিনি 'বিগব্যাঙ' প্রতিভাসের একজন অন্যতম প্রবক্তা) পোপকে বিনয়ের সঙ্গে এধরনের যুক্তিকে 'অভ্রান্ত' হিসেবে প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই পরামর্শ মানছে কে?

মিরাকল নাইন্টিন

প্রার্থনা করে এমন ঠোঁটের চেয়ে একটি কর্মঠ হাত অনেক বেশি উত্তম। ধর্ম এবং বিজ্ঞান দুটি একেবারে দু মেরুর বস্তু হলেও মানুষ আজ একটি জিনিস বুঝতে পেরেছে, বিজ্ঞান আসলে কাজ করে, ফলাফল দেয়। অন্যদিকে, পদে পদে ধর্মের অসাড়তা তারা অনুবাধন করতে পারলেও পরকালের লোভে পড়ে কেউই অবশ্য সেটাকে নিজের মনে জায়গা দিতে চান না। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লোভে ধর্ম আজ তাই নতুন এক খোলসে নিজেদের গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করছে। নিজেদের বিজ্ঞানময় প্রমাণ করে টিকিয়ে রাখতে চাচ্ছে বিজ্ঞানের যুগে। আর তা করতে গিয়ে সৃষ্টি করেছে মিথ্যা, চালাকির এক প্রশান্ত মহাসাগরের। ওপরে তেমন কিছু উদাহরণ নিয়ে আলোচনা হলো। এখন দৃষ্টিপাত করা যাক একেবারে ভিন্ন একটি ব্যাপারের দিকে।

কোরআনে কেবলমাত্র বিজ্ঞানময় কথাবার্তা নয়, নিজের শ্রেষ্ঠত্বের নমুনা মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য স্রষ্টা তার লিখিত এ গ্রন্থে এক অলৌকিক ব্যাপার রেখে দিয়েছেন- তিনি কোরআনকে বেঁধে দিয়েছেন উনিশ সংখ্যা দ্বারা। অলৌকিক এ বিষয়টি অবশ্য মুসলিমদের অজানাই থেকে যেত যদি না এ শতকেই বিষয়টি প্রথমবারের মতো জনসমক্ষে তুলে না ধরতেন রাশাদ খলিফা নামের এক ভদ্রলোক[14]। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে রাশাদ খলিফা মুসলিম বিশ্বে হৈচৈ ফেলে দেন। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন দেশে শ'খানের বেশি বই রচিত হয় বিষয়টি নিয়ে। বাংলাদেশে মেজর কাজী জাহান মিয়া লিখিত 'আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ' নামক বইটির প্রথম চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে এই ১৯ মিরাকল[15]। ডঃ খন্দকার আব্দুল মান্নান লিখিত 'কম্পিউটার ও আল কোরআন' নামক বইটিতে স্থান পেয়েছে ১৯-এর চমৎকারিত্ব[16]। আল-কোরআন অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ আরও এক ধাপ এগিয়ে। কোরআনের একটি বাংলা অনুবাদ করার পর প্রথমে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে রাশাদ খলিফার উনিশের ম্যাজিকের কথা তুলে ধরেন[17]। কী তবে সেই উনিশের ম্যাজিক?

সুরা আল-মুদাচ্ছিরের ৩০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, ইহার উপর আছে উনিশ। এর আগে পরে কী উল্লেখ আছে, কার উপরে উনিশ আছে এমন সকল প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে খলিফা অপ্রাসঙ্গিক ভাবে

---

13 Aparthib Zaman, Mixing Science with Religion, Mukto-Mona

14 http://www.submission.org/quran/app1.html

15 কাজী জাহান মিয়া, *আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ* (মহাকাশ পর্ব-১), প্রকাশক: নাহরীন পারভীন, রায়ের বাজার, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১৭-২৯।

16 ডঃ খন্দকার আব্দুল মান্নান, *কম্পিউটার ও আল কোরআন*, প্রকাশনায়: ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, মীরপুর, ঢাকা, পঞ্চম মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০০৩।

17 হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, কোরআন শরীফ: সহজ সরল বাংলা অনুবাদ, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০২।

শুধুমাত্র আয়াতটি তুলে এনে দাবি করেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ কোরআনকে উনিশ দিয়ে বেধে রাখার কথা উল্লেখ করেছেন। দাবিকে যৌক্তিক প্রমাণের জন্য তিনি কিছু উদাহরণ হাজির করেন। যেমনঃ কোরআনের সুরা সংখ্যা ১১৪ যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য। কোরআনের আয়াত সংখ্যা ৬৩৪৬, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য (১৯×৩৩৪=৬৩৪৬) এবং এ সংখ্যাটির অঙ্কগুলোর যোগফল ১৯ (৬+৩+৪+৬=১৯), কোরআনে 'বিসমিল্লাহ' ১১৪ বার এসেছে যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হয়। এছাড়া 'বিসমিল্লাহ'-তে ১৯টি বর্ণ রয়েছে, কোরআনের সর্বমোট বর্ণসংখ্যা ৩২৯১৫৬, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য (১৯×১৭৩২৪=৩২৯১৫৬), কোরআনে 'আল্লাহ' শব্দটি ২৬৯৮ বার উল্লেখিত হয়েছে যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য (১৯×১৪২=২৬৯৮)। এছাড়া 'আল্লাহ' উল্লেখ আছে এমন আয়াতগুলোর আয়াত নম্বর যোগ করলে যোগফল হয় ১১৮১২৩, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য (১৯×৬২১৭=১১৮১২৩) ইত্যাদি ইত্যাদি। রাশাদ খলিফার প্রদানকৃত পুরো গাণিতিক হিসাবটি যেকোনো মানুষকে আকৃষ্ট করবে। যিনি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী তিনি প্রমাণটি দেখে তৃপ্তির ঢেকুর তুলবেন- জিনিসটা মাথায় রাখার চেষ্টা করবেন, ক্ষেত্র বিশেষে কোনো সংশয়বাদীর সাথে তর্কে লিপ্ত হলে তলোয়ার হিসেবে ব্যবহার করবেন। আর যিনি অবিশ্বাসী তিনিও সামান্য দ্বন্দ্বে পড়ে যাবেন।

অলৌকিক কোরআন নিয়ে আলোচনায় যাবার আগে সামান্য একটু জল ঘোলা করা যাক! সেই পিথাগোরাসের আমল থেকে শুরু হওয়া সংখ্যা নিয়ে এধরনের ধাঁধাময় খেলার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। Numerology তথা সংখ্যাতত্ত্ব হিসেবে পরিচিত বিষয়টি আধুনিক বিজ্ঞান জন্মলগ্নেই গণিত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গিয়েছে; যেমনটি জ্যোতিষশাস্ত্র আলাদা হয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে, আলকেমি আলাদা হয়েছে রসায়ন থেকে। বিজ্ঞানের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অপব্যবহারকেই অপবিজ্ঞান আখ্যায়িত করা হয়। সংখ্যাতত্ত্ব একটি অপরিপূর্ণ গণিত বা অপবিজ্ঞান। সংখ্যাতত্ত্বের উদাহরণ অজস্র। সেই মধ্যযুগ থেকে সংখ্যাতত্ত্বে মত্ত ইহুদিরা সেসময়ই তাদের ধর্মগ্রন্থ তোরাহ-র দ্বিতীয় গ্রন্থ এক্সোডাস থেকে স্রষ্টার রহস্যময় নাম বের করেছিল। এক্সোডাসের ১৪:১৯-২১, এই তিনটি আয়াতের মাধ্যমে তারা স্রষ্টার ৭২টি নাম উদ্ভাবন করেছে। এই প্রতিটি আয়াতে ৭২টি করে বর্ণ আছে। প্রথমে তারা প্রথম আয়াতটি ডান থেকে বামে লিখে তারপর দ্বিতীয় আয়াত বাম থেকে ডানে লিখেছে। সবশেষে তৃতীয় আয়াতটিকে আবার ডান থেকে বামে লিখার মাধ্যমে সম্পূর্ণ কাজটিকে তারা ১৮ টি কলাম এবং ১২ সারিতে ভাগ করা হয়েছে। ১৮ গুণ ১২= ৭২ গুণ ৩ এই সূত্র ধরে তারা ১২টি সারিকে ৩ সারি ৩ সারি করে ভাগ করেছে। মোট চারটি ভাগ হয়েছে যার প্রতিটিতে ১৮ কলাম ও ৩ সারি। প্রতি ভাগের একটি কলাম দ্বারা স্রষ্টার একটি তিন অক্ষরের নাম পাওয়া গেছে। এভাবে মোট ১৮ গুণ ৪ = ৭২ টি তিন অক্ষরের নাম পাওয়া গেছে। চার ভাগের প্রতিটিকে আবার আরেকটি বর্ণের সাথে মেলানোর মাধ্যমে স্রষ্টার চার অক্ষরের একটি নাম পাওয়া গেছে[18]।

আজ অবদি সেই চার অক্ষরের নামটির ও তার সঠিক উচ্চারণ জানার চেষ্টা করছে তারা। আরও মজা পাওয়া যাবে যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত নাইন ইলেভেনের বিমান হামলার ঘটনার সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে। হামলার তারিখ ৯/১১: ৯+১+১=১১; ১১ই সেপ্টেম্বর বছরের ২৫৪তম দিনঃ ২+৫+৪=১১; ১১ই সেপ্টেম্বর পর বছর শেষ হতে ১১১ দিন বাকি থাকে; ১১৯ হচ্ছে ইরাক/ইরানের রাষ্ট্রীয় কোড ১+১+৯=১১; ইংরেজি 'Afghanistan' শব্দটিতে ১১ অক্ষর রয়েছে; ইংরেজি 'The Pentagon' শব্দটিতে ১১ অক্ষর রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। Ernest Vincent Wright (১৮৭৩-১৯৩৯) নামের একজন মার্কিন লেখক 'Gadsby: Champion of Youth' (Wetzel Publishing Co, ১৯৩৯) নামে পঞ্চাশ হাজার একশত দশটি শব্দের এক উপন্যাস লিখেছিলেন। যেখানে তিনি ইংরেজি বর্ণ E আছে এমন একটি শব্দও ব্যবহার করেন নি। কোনো ধরনের ব্যাকরণগত ভুল, বাক্যের অসামঞ্জস্যতা, ভাব প্রকাশের দুর্বলতাবিহীন এ উপন্যাসে ব্যবহৃত হয় নি he,

18 কোরআনের সাংখ্যিক মাহাত্ম্যঃ ভিন্নমত, রায়হান আবীর http://www.cadetcollegeblog.com/raihanabir/1816

she, they, them, theirs, her, herself, myself, himself, yourself, love, hate এর মতো শব্দ[19]!

আসলে একটু মাথা খাটালে পৃথিবীর প্রায় সকল বিষয় নিয়েই সংখ্যাতত্ত্বের খেলা সম্ভব। সেটি গণিতবিদদের দ্বারা সমর্থিত না হলেও মানুষকে আনন্দ কিংবা ধাঁধায় ফেলার জন্য যথেষ্ট।

ধরুন একটি সমুদ্র সৈকত। আপনি একটি নিক্তি নিলেন এবং সমুদ্র সৈকতের একটি একটি করে বালুর ওজন মাপা শুরু করলেন। যেসব বালুর ওজন হচ্ছে এক গ্রাম সেটিকে আপনি থলেতে ভরে রাখলেন। যেগুলো না সেগুলো ফেলে দিলেন। আরও ধরি, আপনার হাতে অফুরন্ত সময় রয়েছে এবং এই অফুরন্ত সময় আপনি শুধু বালুর ওজন মাপবেন এবং এক গ্রামের ওজনের বালু আলাদা করবেন। তাহলে দীর্ঘসময় পর আপনি বেশ বড় একটি বালুর স্যাম্পল যোগাড় করতে পারবেন যাদের প্রত্যেকের ওজন এক গ্রাম করে। এখন যদি আপনি ঘোষণা দেন যে, এই সমুদ্র সৈকতটি একটি মিরাকল এবং এর প্রত্যেকটি বালু কণার ওজন এক গ্রাম তাহলে কী তা যুক্তি সংগত হবে? হবে না।

কারণ গণিত আমাদের বলে, এই সৈকতে প্রতিটি বালুকণার ওজন এক গ্রাম- এই শর্ত আরোপ করার আগে আপনাকে শতকরা কতভাগ বালুর ওজন এক গ্রাম তা নির্ণয় করতে হবে। যদি শতকরা মান ৯০- ৯৯% হয় তাহলে আমরা সেই শর্ত সঠিক বলে ধরে নিতে পারি।

শতকরা= [এক গ্রাম ওজন এমন বালুর সংখ্যা ÷ পরীক্ষণীয় মোট বালুর সংখ্যা (যে বালু আপনি ফেলে দিয়েছেন+ যে বালু আপনি রেখেছেন)] × ১০০

আপনার পরীক্ষায় এক বস্তা বালুর বিপরীতে কমপক্ষে এক হাজার বস্তা বালু আপনি বাদ দিয়েছেন (কারণ তাদের ওজন এক গ্রাম নয়)। সুতরাং আপনার শতকরা মান হবে খুব কম। অর্থাৎ মিরাকলটি সত্যি নয়। মূল ব্যাপার হলো, যেকোনো বই থেকেই আপনি 'বিশেষ কিছু অংশ'/অপশন বাছাই করতে পারেন। তারপর যেই যেই অপশন আপনার মিরাকল প্রমাণে কাজে লাগবে তা রেখে (ধরুন সাত দ্বারা বিভাজ্য) বাকিগুলো ফেলে দিতে পারেন। কোরআনের ক্ষেত্রে যেমন, একটি শব্দের অক্ষর সংখ্যা, চ্যাপ্টারের সংখ্যা, নির্দিষ্ট একটি শব্দ সর্বমোট কতবার ব্যবহৃত হয়েছে সেই সংখ্যা ইত্যাদি- ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে। ঠিক তেমনি ভাবে আপনি চাইলে অন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা, বিজোড় সুরার সংখ্যা, জোড় চ্যাপ্টারের সংখ্যা, বিজোড় চ্যাপ্টারে কতটি অক্ষর রয়েছে- জোড়টিতে কতটি রয়েছে ইত্যাদি নিতে পারেন। অর্থাৎ আপনি মাথা খাটিয়ে অসীম সংখ্যক অপশন/বিশেষ অংশ বাছাই করতে পারেন। ডক্টর খলিফা তাই করেছেন। অসংখ্য অপশন থেকে তিনি উনিশ দ্বারা বিভাজ্য প্রমাণ করা যায় এমন অপশনগুলো গ্রহণ করেছেন- বাকিগুলো ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু কোরআনে যদি আসলেই উনিশের মিরাকল থেকে থাকে তাহলে তা সবকিছুতেই থাকবে- শুধু মাত্র কয়েকটি জিনিসে নয়। যেমন, কোরআনের রুকু সংখ্যা ৫৪০টি, ৩০টি পারা, ৭টি মঞ্জিল রয়েছে, যেগুলো ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হতে পারতো। ২৩ বছর ধরে কোরআন নাযিল হয়েছে সুতরাং ২৩ সংখ্যাটি ১৯ দ্বারা বিভাজ্য হতে পারত, মুহাম্মদ ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন, সেটি ১৯ দ্বারা বিভাজ্য হতে পারত, কোরআনের প্রতিটি আয়াতের শব্দ ও বর্ণ সংখ্যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য হতে পারত। কিন্তু হয় নি[20]!

জল অনেক ঘোলা ইতোমধ্যেই হয়ে গেল। পাঠক হয়তো এখন মনে মনে ভাবছেন, তাতে কী হয়েছে, কতগুলোতেই তো গাণিতিক মিল রয়েছে, ব্যাপারটি অলৌকিক হওয়াই স্বাভাবিক। তবে জেনে রাখুন, লৌকিক বিষয়কে অলৌকিকে রূপান্তরিত করে দর্শকদের মোহাচ্ছন্ন করার জন্য আসলে আশ্রয় নিতে হয় মিথ্যা, প্রতারণার। খলিফাও সেই সূত্র লঙ্ঘন করেন নি। একটি বিষয় নিয়েই আলোচনা করা যাক।

ডক্টর রাশেদ খলিফা বলেন-

> The key to Muhammad's perpetual miracle is found in the very first verse of the Qur'an,

19 পুরো উপন্যাস পাওয়া যাবে এখানেঃ http://www.spinelessbooks.com/gadsby/index.html

20 কোরআনের 'মিরাকল ১৯'-এর উনিশ-বিশ! *সৈকত চৌধুরী এবং অনন্ত বিজয় দাশ,* মুক্তমনা বাংলা ব্লগ। পিডিএফ লিংক http://www.mukto-mona.com/Articles/ananta/nineteen_Ananta_soikot.pdf

> `IN THE NAME OF GOD, MOST GRACIOUS, MOST MERCIFUL = BiSM ALLaH, AL-RaHMaN, AL-RaHIM…

মুহাম্মদের বলে যাওয়া- কোরআন যে একটি মিরাকল তার সন্ধান লাভ করা যায়, কোরআনের সর্ব প্রথম আয়াতেই-

> IN THE NAME OF GOD, MOST GRACIOUS, MOST MERCIFUL = BiSM ALLaH, AL-RaHMaN, AL-RaHIM…

এই প্রথম আয়াতের অক্ষর গণনা করে (ইংরেজিতে শুধু মাত্র বড় হাতের অক্ষর) আমরা দেখতে পাই যে, এখানে উনিশটি অক্ষর রয়েছে। এবং এতে যে শব্দগুলো রয়েছে সেগুলো প্রত্যেকটি উনিশের গুণিতক। যেমন প্রথম অক্ষর, ISM উনিশ বার; দ্বিতীয় শব্দ, ALLaH ২৬৯৮ বার, যা ১৯ এর গুণিতক (১৯ X ১৪২); তৃতীয় শব্দ, AL-RaHMaN আছে ৫৭ বার, (১৯ X ৩); সর্বশেষ শব্দ, AL-RaHIM আছে ১১৪ বার (১৯ X ৬)।

ডঃ খলিফা দাবি করেছেন, কোরআনের এই অলৌকিকত্বে মানুষের কোনো হাত নেই। অথচ, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বাক্যে যে ১৯টি বর্ণ আছে, এই মৌলিক দাবিতেই মানুষের হাত আছে। আরবি বাক্যটিকে ইংরেজিতে প্রতিবর্ণীকরণ করার সময় আমরা যদি স্বরবর্ণ বাদ দেই, তাহলে বাক্যটি এরকম দাঁড়ায়: BSM ALLH ALRHMN ALRHIM, উল্লেখ্য, আরবিতে স্বরবর্ণগুলো লেখা হয় না, পড়ার সময় ধরে নেয়া হয়। এই প্রতিবর্ণীকৃত বাক্যে বর্ণের সংখ্যা ১৯। কিন্তু, আরবিতে 'তাশদিদ' বলে একটি প্রতীক আছে, কোনো বর্ণের উপর সে প্রতীক থাকলে তা দুই বার উচ্চারণ করতে হয়। ALLAH শব্দের দ্বিতীয় L এর উপর একটি তাশদিদ আছে। সেক্ষেত্রে এই লাম দুইবার উচ্চারণ করে এভাবে লেখা যেত (বা এভাবে লেখা উচিত): ALLLAH; আর বর্ণ সংখ্যা হয়ে যেত ২০টি।

তাশদিদ যুক্ত বর্ণ দুইবার ধরা হয়েছে নাকি একবার ধরা হয়েছে, সে বিষয়টি ডঃ খলিফা কোথাও স্পষ্ট করে বলেন নি। এছাড়া যে স্বরবর্ণগুলো লেখা হয় না, কিন্তু পড়ার সময় ধরা হয় সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা বা বাদ দেয়ার ব্যাপারটাও তিনি স্পষ্ট করেন নি।

পরবর্তী সমস্যা BISM শব্দ নিয়ে। এটি প্রকৃতপক্ষে দুটি শব্দের সমন্বয়ঃ Bi (এক্ষেত্রে এই শব্দের অর্থ 'মধ্যে') এবং ISM (অর্থ 'নাম')।

ডঃ খলিফা সবসময় আরবি বর্ণক্রম ব্যবহারের কথা বলেছেন। এই আরবি বর্ণক্রম ব্যবহার করে ISM শব্দটির অনুসন্ধান করা যেতে পারে। আবদুল বাকি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কোরআনের একটি নির্ঘণ্ট ঘেটে এই আশ্চর্যজনক তথ্য পাওয়া গেছে-

> BiSM শব্দটি কোরআনের প্রথম আয়াতেই আছে। এই শব্দটি কোরআনের মাত্র তিনটি স্থানে উল্লেখিত হয়েছেঃ ১:১১, ১১:৪১ এবং ২৭:৩০।
>
> কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে কেবল ISM শব্দটি কোরআনে মোট ১৯ বার উল্লেখিত হয়েছে।
>
> কিন্তু তৃতীয় আরেকটি তালিকা আছে। ISMuHu শব্দের অর্থ 'তার নাম'। এটি আরবিতে একটি অখণ্ড শব্দ হিসেবে লেখা হয়। কোরআনে এটি ৫ বার এসেছে।
>
> সবগুলো ফলাফল যোগ করলে পাওয়া যায়ঃ ৩ + ১৯ + ৫ = ২৭, স্পষ্টতই এখানে ১৯ এর সাংখ্যিক তাৎপর্য আর থাকছে না।

আমাদের সামনে আরও অনেকগুলো অনুমানের ব্যাপার আছে, যেগুলো সম্বন্ধে ডঃ খলিফা কোনো ব্যাখ্যা দেন নি। কোন বিবেচনায় তিনি তিনবার উল্লেখিত BiSM শব্দটি গণনা থেকে বাদ দিয়েছেন? যে শব্দ নিয়ে গবেষণা করছিলেন সেই শব্দটিই বাদ দেয়ার পিছনে কোনো যুক্তিই দেখান নি। আর কেবল বিচ্ছিন্ন ISM শব্দ গণনার ব্যাপারেই বা তিনি কোন নীতি অনুসরণ করেছেন? সর্বনামযুক্ত বিশেষ্য IS-MuHu কে কেন বাদ দিলেন?

তাহলে কি এই তিন ধরনের শব্দের অর্থের মধ্যে কোনো ব্যাখ্যা লুকিয়ে আছে? হয়তবা, যেসব স্থানে

এই শব্দগুলোর মাধ্যমে কেবল আল্লাহ্‌র নাম বোঝানো হয়েছে সেগুলোকেই ডঃ খলিফা গণনা করেছেন। কিন্তু নিম্নোক্ত দুটি আয়াতের দিকে লক্ষ্য করলে এই ধারণাও ভুল বলে প্রমাণিত হয়। সুরা মায়িদার ৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে-
'…but pronounce God's name (ISM ALLaH) over it…'

এবং সুরা বাকারার ১১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে-
'And who is more unjust than he who forbids in places for the worship of God, that His name (ISMuHu) should be pronounced?'

মূল আরবি বা ইংরেজি অনুবাদ কোনোটিতেই এই শব্দগুলোর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই, একটি ছাড়াঃ এখানে 'God's name' সরাসরি বিধেয় এবং 'His name' উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবি বর্ণক্রমে এই শব্দ দুটির লেখ্য রূপের ভিত্তিতেই কেবল দুটিকে ভিন্নস্থানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আরও কথা আছে, কিসের ভিত্তিতেই বা ডঃ খলিফা এই শব্দগুলোর বহুবচন রূপগুলো বাদ দিলেন? এগুলোর বহুবচন কোরআনে আরও ১২ বার এসেছে। বিশেষত সুরা আ'রাফের ১৮০ নম্বর আয়াতের কথা উল্লেখ করা যায়, 'The most beautiful names belong to God…'

বহুবচন বাদ দেয়ার কেবল একটি কারণই থাকতে পারে। সেটি হচ্ছে, বহুবচনগুলো গণনা করলে মোট সংখ্যাটি ১৯ না হয়ে ৩৯ হয়ে যায়।

উপরন্তু ALLAH শব্দটির ব্যবহারের ধরনের ব্যাপারেও সন্দেহ আছে। এই শব্দের সাথে যখন Li উপসর্গ যুক্ত হয় তখন দুইয়ে মিলে LiLaH বা LiLLah শব্দের জন্ম দেয়। এখানে উপসর্গটির অর্থ 'প্রতি'। এই লিল্লাহ শব্দেও একটি লাম এর উপর তাশদিদ আছে। (উদাহরণ হিসেবে ২:২২ আয়াতটি দেখা যেতে পারে।) ব্যাকরণ অনুসারে এই প্রসর্গযুক্ত শব্দটি ঠিক BiSM এর মতো করেই ব্যবহৃত হয়। পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি ডঃ খলিফা এবার প্রসর্গযুক্ত শব্দগুলো বাদ দিয়ে কেবল মূল শব্দটিই গণনা করবেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। এবার ঠিকই LiLaH গুলো গণনা করেছেন, কারণ এগুলো গণনা না করলে মোট সংখ্যাটা ২৬৯৮ হতো না এবং তা ১৯ দিয়েও বিভাজ্য হতো না। এধরনের যাদৃচ্ছিক ব্যবহারের পেছনে কি আদৌ কোনো যুক্তি আছে?

ISM এর সাথে Bi যুক্ত হয়ে যখন BiSM হয়েছে তখন ডঃ খলিফা সেটা বাদ দিয়েছেন, কিন্তু ALLAH-র সাথে Li যুক্ত হয়ে যখন LiLaH হয়েছে তখন তিনি সেগুলো ঠিকই গণনা করেছেন; কেবল ১৯ দিয়ে বিভাজ্য একটি সংখ্যায় পৌঁছানোর জন্য।

AL-RaHMaN শব্দের ক্ষেত্রে কোনো দ্বিধা নেই। এটি কোরআনে ৫৭ (১৯ X ৩) বারই উল্লেখিত হয়েছে। লেখকও এমনটিই বলেছেন।

এবার AL-RaHIM শব্দের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। ডঃ খলিফা বলেছেন, এই শব্দ মোট ১১৪ (৬ X ১৯) বার এসেছে। কিন্তু আবদুল-বাকির নির্ঘণ্ট অনুসারে কোরআনে এই শব্দটি হুবহু এই রূপে মাত্র ৩৪ বার উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ এই ৩৪ স্থানেই শব্দের আগে AL নামক ডেফিনিট আর্টিক্‌লটি আছে। কিন্তু বাকি ৮১ স্থানে শব্দের আগে কোনো ডেফিনিট আর্টিক্‌ল নেই। এখন আর্টিক্‌লসহ এবং ছাড়া সবগুলোই যদি আমরা গণনা করি, তাহলে মোট সংখ্যাটি দাঁড়ায় ১১৫। এক বার এর বহুবচনও উল্লেখিত হয়েছে। তাহলে মোট ১১৬ হয়ে যাচ্ছে। ১১৫ এবং ১১৬, কোনোটিই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়।

ডঃ খলিফার এই আবিষ্কারকে অনেকেই সম্পূর্ণ অনুমোদন দিয়েছেন। ডঃ Bèchir Torki এ নিয়ে রীতিমতো ৪ পৃষ্ঠার এক বিশাল সারাংশ রচনা করেছেন। এইসবগুলো অনুমোদনপত্র বা সারাংশতেও উপরে উল্লেখিত চারটি মৌলিক অনুমিতির ব্যাপার সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

ডঃ খলিফা ALLAH শব্দে তাশদিদের কারণে দ্বিত্ব হয়ে যাওয়া লামগুলো গণনা থেকে বাদ দিয়েছেন, আবার অলিখিত স্বরবর্ণগুলোও বাদ দিয়েছেন।

তিনি ISM এর মোট সংখ্যা গণনা করতে গিয়ে BiSM শব্দটি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন, কিন্তু ওদিকে আবার ALLaH শব্দ গণনা করতে গিয়ে LiLaH অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এছাড়াও তিনি তার গণনা থেকে ISMuHu বাদ দিয়েছেন, যদিও ব্যকরণগত দিক দিয়ে এটি হুবহু ISM এর মতোই অর্থ বহন করে।

এছাড়া তিনি ISM এবং AL-RaHIM শব্দের বহুবচন রূপগুলো বাদ দিয়েছেন।

উপরন্তু তার AL-RaHIM শব্দের গণনা ভুল হয়েছে।

সুতরাং মিরাকল প্রমাণের জন্য খলিফা নিজের ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন- মিল করার জন্য। কিন্তু সে ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করেন নি। যেমন, সুরা আল-মুদাচ্ছির (৭৪) এর ৩০ নম্বর আয়াতে যে ১৯ এর উল্লেখ আছে, তার আগে এবং পরের আয়াতগুলো পাঠ করলেই বোঝা যায় যে সেখানে দোজখের উনিশজন ফেরেশতার সংখ্যার কথাই কেবল বলা হয়েছে। অথচ রাশাদ খলিফা সেই একটি আয়াতকে পুঁজি করে তিলকে তাল বানিয়ে ছেড়েছেন। তার অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলোও একই দোষে দোষি। বুদ্ধিমান পাঠকেরা নিজেরাই তা যাচাই করে নিতে পারবেন। ইন্টারনেটে সাবমিশন ডট অরগ সাইটে রাশাদ খলিফার কোরআনের অনুবাদ রাখা আছে। সেখান থেকে আল তওবা পড়লে যে কেউ দেখবেন, রাশাদ খলিফার কোরআনের অনুবাদে উনি ১৯ তত্ত্বকে সার্থকতা দিতে গিয়ে ৯:১২৮ এবং ৯:১২৯ - এই আয়াতগুলো গায়েব করে দিয়েছেন। সত্য সত্যই খলিফার কোরআনের অনুবাদে ওই দুটো আয়াত নেই। এবার ইন্টারনেটের অন্য যে কোন ইসলামিক সাইট থেকে কোরআনের অন্য অনুবাদগুলোতে (যেমন ইউসুফ আলী, পিকথাল, শাকির প্রমুখ) চোখ বুলিয়ে নিন। আপনি রাশাদ খলিফার কোরআন প্রবঞ্চনার জলজ্যান্ত উদাহরণ হাতে নাতে পেয়ে যাবেন। আবার কোন কোন সুরাতে খলিফা নিজের নাম পর্যন্ত বসিয়ে দিয়েছেন অনুবাদে (যেমন,কোরআন ৮১:২২ দ্রঃ)। এগুলো রাশাদ খলিফার কোরআন টেম্পারিং এর ছোট্ট কিছু উদাহরণ। এমনকি রাশাদ খলিফা নিজেকে আল্লাহর রসুল হিসেবেও ঘোষণা দিয়েছিলেন (তার মতে কোরাণের ৩৬:৩ এ নাকি সেটা আল্লাহ বলে দিয়েছেন) । যারা কোরআনের ১৯ তত্ত্ব নিয়ে গর্বিত তারা সকলেই এর পেছনের বুজরুকিগুলো হয় চেপে যান, নয়তো জানেন না। তার অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলোও একই দোষে দোষী। সেগুলো এবং অনান্য বিভিন্ন ঘটনার গাণিতিক মিরাকল নিয়ে বাংলা ব্লগের অন্যতম সেরা লেখা হিসেবে ভাস্কর মুক্তমনায় সৈকত চৌধুরী এবং অনন্ত বিজয় দাশের লেখা, কোরআনের 'মিরাকল ১৯'-এর উনিশ-বিশ[21]! তাদের এ প্রবন্ধটি শুদ্ধস্বর থেকে প্রকাশিত 'পার্থিব' বইয়েও সঙ্কলিত হয়েছে[22]। সে প্রবন্ধটিতে লেখকদ্বয় সুচারুভাবে রাশাদ খালিফার ১৯ তত্ত্বের তথাকথিত অলৌককতাকে যুক্তির আলোয় খণ্ডন করে উপসংহার টেনেছেন এই বলে -

- উনিশ নিয়ে কোরআনের অলৌকিকত্ব প্রমাণের রাশেদ খলিফার দাবি অন্তঃসারশূন্য।
- কোরআনের সুরা আল-মুদাচ্ছির (৭৪) এর ৩০ নম্বর আয়াতে শুধুমাত্র দোজখের ফেরেশতাদের সংখ্যা বলা হয়েছে; কোনো অলৌকিক সংখ্যা (যেমনটা রাশেদ খলিফা দাবি করেছেন) বা অন্য কিছু বলা হয়নি।
- রাশেদ খলিফা কোরআন শরিফে 'অলৌকিকত্বের উপস্থিতি' প্রমাণের জন্য কোরআনের আয়াতে যেমন পরিবর্তন করেছেন, তেমনি আয়াত কেটে কমিয়ে দিয়েছেন, ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

21 কোরআনের 'মিরাকল ১৯'-এর উনিশ-বিশ! *সৈকত চৌধুরী এবং অনন্ত বিজয় দাশ,* মুক্তমনা বাংলা ব্লগ। পিডিএফ লিংক http://www.mukto-mona.com/Articles/ananta/nineteen_Ananta_soikot.pdf

22 অনন্ত বিজয় দাশ এবং সৈকত চৌধুরী, পার্থিব, শুদ্ধস্বর, ২০১১

- এই ধরনের কথিত 'মিরাকল' ধর্মগ্রন্থ কোরআন ছাড়াও আরো অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে।
- (ইসলামি ভাষ্য মতেই) সম্পূর্ণ কোরআন যেহেতু লিখিতরূপে নাযিল হয়নি, তাই এর লিখিতরূপের মধ্যে অলৌকিকতা খুঁজে পাওয়া উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং অপ্রাসঙ্গিকও বটে। একটি ভাষার লিখিতরূপ ভাষা বিশেষজ্ঞরা সময়ে-সময়ে গণমানুষের প্রয়োজনে নির্ধারণ করে থাকেন। পরিবর্তন-পরিবর্ধন-সংযোজন-বিয়োজন ঘটান। অর্থাৎ ভাষার লিখিতরূপ সম্পূর্ণ লৌকিক।

যে উদ্দেশ্য বা বক্তব্য প্রকাশ করতে অনন্ত বিজয় এবং সৈকত চৌধুরী গুরুত্বপূর্ণ এ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, এই বইয়ের মাধ্যমে আমরাও ঠিক সেই একই আহবান করতে চাই - অতিরঞ্জন এবং অতিকথায় গা ভাসিয়ে না দিয়ে সংশয় এবং যুক্তি দিয়ে অভিনিবেশ সহকারে ধর্মগ্রন্থগুলো পাঠ করা প্রয়োজন।

সবই ব্যাদে আছে

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ওই অনলাইন পত্রিকাটিতে অধ্যাপক ভদ্রলোকের সাথে বিতর্কের কারণে কোরআন এবং কোরআন-বিশেষজ্ঞদের কথা বারে বারে উঠে এসেছে বলে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই যে অন্যান্য ধর্মের 'কিতাব বিশেষজ্ঞের দল' এই অভিযোগ থেকে মুক্ত। এরা কেউই আসলে ধোয়া তুলসি-পাতা নয়; বরং, একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। কিছু হিন্দু ভাববাদী 'বৈজ্ঞানিক' আছেন, যারা মনে করেন মহাভারতে কৃষ্ণ অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছে তা আসলে বিগব্যাঙ ছাড়া কিছু নয়। মৃণাল দাসগুপ্ত ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমীর বিখ্যাত বিজ্ঞানী। উনি দাবি করেন, আজ আধুনিক বিজ্ঞান যে সমস্ত নতুন তত্ত্ব ও তথ্য প্রতিদিনই আবিষ্কার করছে, তার সবকিছুই নাকি প্রাচীনকালের মুনি ঋষিরা বের করে গেছেন। বেদে নাকি সেসমস্ত আবিষ্কার 'খুবই পরিষ্কারভাবে' লিপিবদ্ধ আছে। মিঃ দাসগুপ্তের ভাষায়, রবার্ট ওপেনহেইমারের মতো বিজ্ঞানীও নাকি গীতার বিশ্বরূপ দর্শনে এতই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে ল্যাবরেটরিতে আণবিক শক্তির তেজ দেখে নাকি গীতা থেকে আবৃত্তি করেছিলেন-

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ ভাসস্তস মহাত্মনঃ

বিজ্ঞান জানা কিছু শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবী আছেন যারা ভাবেন আধুনিক বিজ্ঞান আজ যা আবিষ্কার করছে, তা সবই হিন্দু পুরাণগুলোতে লিপিবদ্ধ জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি। হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন তাদের মুখপত্র 'উদ্বোধন' এ বলা শুরু করেছে যে, কৃষ্ণ গহ্বর কিংবা সময় ধারণা নাকি মোটেই নতুন কিছু নয়। হিন্দুধর্ম নাকি অনেক আগেই এগুলো জানতে পেরেছিল। কীভাবে? ওই যে বহুল প্রচারিত সেই আপ্তবাক্যে- 'ব্রহ্মার এক মুহূর্ত পৃথিবীর সহস্র বছরের সমান'। কিছু ধর্মবাদীর দৃষ্টিতে মহাভারতের কাল্পনিক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছিল আসলে এক 'পারমাণবিক যুদ্ধ' (Atomic War)। প্রশান্ত প্রামানিক নামে ভারতের এক 'জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক' 'ভারতীয় দর্শনে আধুনিক বিজ্ঞান' বইয়ে তার কল্পনার ফানুসকে মহেঞ্জোদাড়ো পর্যন্ত টেনে নিয়ে বলেছেন-'সম্ভবত দুর্যোধনেরই কোনো মিত্র শক্তি পারমাণবিক যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে থাকবে মহেঞ্জোদাড়োতে' (পৃঃ ৬)। 'সবই ব্যাদে আছে' মার্কা এইসব বকচ্ছপ ভাববাদীরা অবলীলায় দাবি করে ফেলেন যে, নলজাতক শিশু (Test Tube Baby) আর বিকল্প মা (Surrogate Mother) আধুনিক বিজ্ঞানের দান মনে করা হলেও তা হিন্দু সভ্যতার কাছে নাকি নতুন কিছু নয়। দ্রোণ-দ্রোণী, কৃপ-কৃপীর জন্মের পৌরাণিক কাহিনিগুলো তারই প্রমাণ। এমন কি কিছুদিন আগে উপসাগরীয় যুদ্ধে ব্যবহৃত স্কাড আর প্যাট্রিয়ট মিসাইল নাকি হিন্দু পুরাণে বর্ণিত 'বরুন বাণ' আর 'অগ্নিবাণ' বই কিছু নয়। তারা সবকিছুতেই এমনতর মিল পেয়ে যান। যেমনি ভাবে ভারতের 'দেশ' এর

মতো প্রগতিশীল পত্রিকায় ২২ এপ্রিল ১৯৯৫ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘বিজ্ঞান ও ভগবান’ নিবন্ধের লেখক হৃষিকেশ সেন বেদান্তে বর্ণিত উর্ণনাভ বা মাকড়শার মধ্যে বিশ্বব্রহ্মান্ডের মডেলের মিল পেয়ে গেছেন।

ভারতের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা একবার মাসিক ভারতবর্ষের 'একটি নতুন জীবন দর্শন' (১৩ নভেম্বর, ১৯৩৮) শিরোনামের একটি প্রবন্ধে এই মানসিকতাকে কটাক্ষ করেছিলেন এই বলে -'সবই ব্যাদে আছ'! এ নিয়ে অনিলবরণ রায় নামের এক হিন্দুবাদী ধার্মিক নরকগুলজার শুরু করলে, এর ব্যাখ্যা মেঘনাদ সাহা দিয়েছিলেন এভাবে:

সবই ব্যাদে আছে !

প্রায় আঠারো বৎসর পূর্বেকার কথা। আমি তখন প্রথম বিলাত হইতে ফিরিয়াছি। বৈজ্ঞানিক জগতে তখন আমার সামান্য কিছু সুনাম হইয়াছে। ঢাকা শহরবাসী লব্ধপ্রতিষ্ঠিত এক উকিল আমি কি বৈজ্ঞানিক কাজ করিয়াছি তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি উৎসাহভরে তাহাকে আমার প্রথম জীবনের তদানীন্তন গবেষণা সম্বন্ধে সবিশেষ বর্ণনা দেই। তিনি দু-এক মিনিট পরপরই বলিয়া উঠিতে লাগিলেন, 'এ আর নতুন কি হইল, এ সমস্তই ব্যাদ এ আছে'। আমি দু একবার মৃদু আপত্তি করিবার পর বলিলাম, 'মহাশয় এ সব তত্ত্ব বেদের কোন্ অংশে আছে তাহা অনুগ্রহ পূর্বক দেখাইয়া দিবেন কি?' তিনি বলিলেন, 'আমি তো ব্যাদ পড়ি নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমরা নূতন বিজ্ঞানে যাহা করিয়াছ বলিয়া দাবি কর, তাহা সমস্তই 'ব্যাদে' আছে'।

বলা বাহুল্য যে, বিগত কুড়ি বৎসর ধরিয়া বেদ, উপনিষদ, পূরাণ ইত্যাদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র এবং হিন্দু জ্যোতিষ ও অপরাপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আমি কোথাও আবিস্কার করিতে সক্ষম হই নাই যে, এই সমস্ত প্রাচীনগ্রন্থে বর্তমান বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব নিহিত আছে।

অনেকে মনে করেন, ভাস্করাচর্য একাদশ শতাব্দীতে অতিস্পষ্টভবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তিনি নিউটনের সমতুল্য। অর্থাৎ নিউটন আর নতুন কি করিয়াছে? কিন্তু এই সমস্ত "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" শ্রেণীর তার্কিকগন ভুলিয়া যান যে, ভাস্করাচর্য কোথাও পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ সূর্যের চারিদিকে বৃত্তাভাস (elliptical) পথে ভ্রমণ করিতেছে - একথা বলেন নাই। তিনি কোথাও প্রমাণ করেন নাই যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও গতিবিদ্যার নিয়ম প্রয়োগ করিলে পৃথিবীর এবং অপরাপর গ্রহের পরিভ্রমণপথ নিরূপণ করা যায়। সুতরাং ভাস্করাচর্য বা কোন হিন্দু, গ্রীক বা আরবী পন্ডিত কেপলার, গ্যালিলিও বা নিউটনের বহুপূর্বেই মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিস্কার করিয়াছেন, এইরূপ উক্তি করা পাগলের প্রলাপ বই কিছু নয়।

খ্রিস্টান সমাজেও এই ধরনের 'হাসজারু' প্রচেষ্টা বিরল নয়। বিজ্ঞানী- ফ্রাঙ্ক টিপলার- পদার্থবিজ্ঞানে অবদানের জন্য ইদানীং যত না বিখ্যাত, তার চেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছেন খ্রিস্টধর্মকে 'বিজ্ঞান' বানানোর জন্য। ওমেগা পয়েন্ট নামে একটি ধারণা দিয়েছেন টিপলার যা মহাসংকোচন (বিগ ক্রাঞ্চ)-এর সময় সিঙ্গুলারিটির গাণিতিক মডেলকে তুলে ধরে। এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু টিপলার মনে করেন এই ওমেগা পয়েন্টই হচ্ছে 'গড'। শুধু তাই নয়, যিশুর অলৌকিক জন্মকে (ভার্জিন বার্থ) তিনি বৈজ্ঞানিক বৈধতা দিতে চান যিশুকে বিরল xx male বানিয়ে, যিশুর পুনরুত্থানকে ব্যারন অ্যানাইহিলেশন প্রক্রিয়ার সাথে তুলনা করেছেন, ইনকারনেশন বা অবতারকে বলেছেন বিপরীতমুখী ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন পদ্ধতি, ইত্যাদি। এ সমস্ত রঙ-বেরঙ এর গালগপ্প নিয়েই তার সাম্প্রতিক বই The Physics of Christianity (2007)! বলা বাহুল্য মাইকেল শারমার, ভিকটর স্টেঙ্গর, লরেন্স ক্রাউসসহ অনেক বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকই টিপলারের যুক্তিকে খণ্ডন করেছেন[23], কিন্তু তাতে অবশ্য আধুনিক 'বিজ্ঞানময়' খ্রিস্ট-ধর্মোন্মাদনা থেমে যায় নি, যাবেও না। ফ্রাঙ্ক টিপলারের অনেক আগে ১৯৭৫ সালে ফ্রিজোফ কাপরা একই মানসপটে লিখেছিলেন 'The Tao of Physics'- প্রাচ্যের তাওইজমের সাথে বিজ্ঞানকে জুড়ে দিয়ে। চীনের প্রাচীন দার্শনিকেরা ইন এবং য়্যান (yin and yang) নামে পরস্পরবিরোধী কিন্তু একীভূত সত্তার কথা বলেছিলেন- মানুষের মনে ভালো-মন্দ মিলেমিশে থাকার প্রসঙ্গে। ফ্রিজোফ কাপরা সেই ইন এবং ইয়াংকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলেন কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার জগতে- পদার্থের দ্বৈত সত্তার (dual nature of matter) বর্ণনা হাজির করে- পদার্থ যেখানে কখনো কণা হিসেবে বিরাজ করে, কখনোবা তরঙ্গ হিসেবে। আধুনিক পদার্থবিদ্যার শূন্যতার ধারণাকে মিলিয়ে দিয়েছেন তাওইজমের 'চী' (ch'i or qi)-এর সাথে-

> যখন কেউ জানবে যে, মহাশূন্য 'চী' দিয়ে পরিপূর্ণ, তখনই কেবল সে অনুধাবন করবে, শূন্যতা বলে আসলে কিছু নেই।

মুক্তমনার বিশিষ্ট সদস্য 'অপার্থিব জামান' ধর্মগ্রন্থের মধ্যে 'বিজ্ঞান খোঁজার' এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে একটি নিবন্ধে লিখেছিলেন-

> প্রায়শই ধর্মবাদীরা ধর্মগ্রন্থের একটি নির্দিষ্ট আয়াত বা শ্লোকের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান খুঁজে পান। এটি একটি হাস্যকর অপচেষ্টা। ওমনিভাবে খুঁজতে চাইলে যেকোনো কিছুতেই বিজ্ঞান কে খুঁজে নেওয়া সম্ভব। যেকোনো রাম-শ্যাম-যদু-মধু আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কারের অনেক আগে কোনো কারণে বলে থাকতে পারে– 'সবকিছুই আসলে আপেক্ষিক'। কিন্তু আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কারের পর সেই সমস্ত রাম-শ্যাম-যদু-মধুরা যদি দাবি করে বসে এই বলে-'হুঁ! আমি তো আইনস্টাইনের আগেই জানতাম আপেক্ষিক তত্ত্বের কথা' তবে তা শুধু হাস্যকর ই নয়, যে সমস্ত নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানীরা তাদের শ্রমলব্ধ গবেষণার মাধ্যমে নিত্য-নতুন আবিষ্কারে পৃথিবীবাসীকে উপকৃত করে চলেছেন, তাদের প্রতি চরম অবমাননাকরও বটে। সবাই জানে, আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য আইনস্টাইনকে কখনোই কোনো ধর্মগ্রন্থের সাহায্য নিতে হয় নি, বরং আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কারের পর পরই তা ধর্মবাদীরা নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে জুড়ে দেওয়ার জন্য নানা জায়গায় মিল খুঁজে পেতে শুরু করলেন। বলা বাহুল্য, আধুনিক বিজ্ঞান যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দানে এখনও অক্ষম, সেই সমস্ত জায়গায় ধর্মবাদীরাও কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। যেমন, বিজ্ঞান এখনও নিশ্চিতভাবে জানে না যে আমাদের এই মহাবিশ্ব বদ্ধ, খোলা নাকি ফ্ল্যাট। তাই ধর্মবাদীদেরও কেউ তাদের ঐশী কিতাব থেকে আমাদের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করে কোনো ধরনের আলোকপাত করতে পারছেন না। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, বিজ্ঞানের কল্যাণে কখনো যদি এর উত্তর বেরিয়ে আসে, তবে সাথে সাথে ধর্মবাদীরা বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের কতকগুলো অস্পষ্ট আয়াত অথবা শ্লোক হাজির করে এর

23 বিস্তারিত তথ্যের জন্য পাঠকেরা পড়ুন অধ্যাপক ভিকটর স্টেংগরের 'In The Name Of The Omega Point Singularity' (Free Inquiry 27. No. 5 August/September 2007) ; এবং ডঃ লরেন্স ক্রাউসের 'More dangerous than nonsense' (New Scientist, 12 May 2007)।

> অতিপ্রাকৃততা দাবি করবেন। মূলত প্রতিটি ক্ষেত্রেই (গোঁজা) মিলগুলো পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো প্রকাশ পাওয়ার পর, তার আগে নয়। এ কি স্রেফ ঘটনার কাকতালীয় সমাপতন?

আমরা অপার্থিব জামানের মন্তব্যের সাথে সামগ্রিকভাবে একমত। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধর্মগ্রন্থে 'আধুনিক বিজ্ঞানের' সন্ধান পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো প্রকাশ পাওয়ার পর, তার আগে নয়। কারণ বিজ্ঞানের দায় পড়ে নি ধর্মগ্রন্থ থেকে সবক নিয়ে আলোর সন্ধান লাভ করতে, বরং ধর্মগুলোই জেনে গেছে, বিজ্ঞান ছাড়া তারা টিকে থাকতে পারবে না। কাজেই, নিত্য-নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোকে ধর্মগ্রন্থের সাথে জুড়ে দেবার জন্য ধর্মবাদীরা এখন মুখিয়ে থাকে। একটা সময় বাইবেল–বিরোধী সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব প্রকাশের জন্য কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, ব্রুনোর উপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়েছিল বাইবেল-ওয়ালারা, সেই তারাই এখন বাইবেলের নানা জায়গায় সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বের 'আলামত' পেয়ে যান। কোরআনের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার খাটে। কিছুদিন আগেও দেখতাম অনেকেই ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে রীতিমতো জিহাদ শুরু করেছিলেন কোরআনের আয়াতকে উদ্ধৃত করে, আজকে যখন বিবর্তনতত্ত্বের সপক্ষের প্রমাণগুলো এতই জোরালো হয়ে উঠেছে যে, সেগুলোকে আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না। তাই শুরু হয়েছে বিবর্তনবাদের সপক্ষে আয়াত খোঁজা। পেয়েও গেছেন কিছু কিছু। একটা ওয়েব সাইটে দেখলাম, ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে যে, কোরআনের ৪:১, ৭:১১, ১৫:২৮-২৯, ৭৬:১-২ প্রভৃতি আয়াতগুলো নাকি বিবর্তন তত্ত্বের 'সরাসরি' প্রমাণ। এ সমস্ত আয়াতে 'সৃষ্টি' বোঝাতে 'খালাকা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'গ্র্যাজুয়াল চেঞ্জ'- অতএব- 'ইহা বিবর্তন'। অনুমান- আর কয়েক বছরের মধ্যে শুধু বিবর্তন নয়, অচিরেই তারা মাল্টিভার্স, কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন, স্ট্রিং তত্ত্ব, প্যান্সপারমিয়া, জিনেটিক কোড, মিউটেশন- এধরনের অনেক কিছুই ধর্মগ্রন্থে পেয়ে যাবেন (কিছু কিছু হয়তো এর মধ্যেই পেয়েও গেছেন)। তবে এধরনের সমন্বয়ের জব্বর খেলা দেখিয়েছে হিন্দু ধর্মবাদীরাই। যখন বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকে ফ্রেডরিখ হয়েল, হারমান বন্দি আর জয়ন্ত নারলিকার মিলে স্থিতিশীল মহাবিশ্ব তত্ত্বের (Steady state theory) অবতারণা করেছিলেন, তখন তা ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের মধ্যে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, কারণ এটি বেদে বর্ণিত 'চির শাশ্বত' মহাবিশ্বের ধারণার সাথে মিলে যায়। কিন্তু মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণের (Cosmic background radiation) খোঁজ যখন বিজ্ঞানীরা পেলেন, তখন তা স্থিতিশীল মহাবিশ্বকে হটিয়ে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব বা বিগব্যাঙকে বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে দিলো। হিন্দুত্ববাদীরাও সাথে সাথে ভোল পালটে 'চির শাশ্বত' মহাবিশ্ব বাদ দিয়ে 'অদ্বৈত ব্রহ্ম'-এর খোঁজ পেয়ে গেলেন। অর্থাৎ, মহাবিশ্বের সৃষ্টি থাকুক, না থাকুক, চিরশাশ্বত হোক আর না হোক, স্থিতশীল হোক আর অস্থিতিশীলই হোক- সবই কিন্তু তাদের ধর্মগ্রন্থে আছে।

ধর্মবাদীদের গোঁজামিল দেওয়ার এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা (সঠিকভাবে বললে 'অপচেষ্টা') দেখে প্রবীর ঘোষ তার 'কেন আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না' বইতে খুবই মজার একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন-

> ধরা যাক, রাস্তার একটি মাতালকে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মডেল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। মাতালটি হয়তো রক্ত-চোখে প্রশ্নকারীর দিকে তাকিয়ে থেকে রাস্তা থেকে পড়ে থাকা মদের বোতলটি তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে গলায় মদ ঢালতে শুরু করলো। তারপর অবশেষে শূন্য বোতলটি রাস্তায় ফেলে দিয়ে হেঁটে চলে গেল। পুরো ব্যাপারটিকে কিন্তু ইচ্ছে করলেই বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের সাথে গোঁজামিল দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায়। মদের বোতলটি যখন পূর্ণ ছিল, সেই অবস্থাটিকে আমাদের এখনকার প্রসারণশীল মহাবিশ্বের সাথে তুলনা করা যায়। মাতালটি গলায় মদ ঢেলে বোতল খালি করতে শুরু করলো এই বোঝাতে যে, এক সময় বিশ্বের এই প্রসারণ থেমে যাবে আর শুরু হবে সংকোচন। শেষ পর্যন্ত মাতালটি শূন্য বোতল রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এটাই বোঝাতে চাইছে যে মহাবিশ্ব সংকুচিত হতে হতে পূর্বের সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করে

সিংগুলারিটি বিন্দুতে চলে আসবে।

কী অদ্ভূত 'মহা-বিজ্ঞানময়' নির্বুদ্ধিতা! বাংলাদেশে বেশ ক'বছর ধরেই চলছে এই নির্বুদ্ধিতার খেলা, মাতাল সাজার আর মাতাল বানানোর নিরন্তর প্রক্রিয়া। এখানে 'জ্ঞানের কথা', 'লজ্জা' 'নারী'র মতো প্রগতিশীল বই অবলীলায় নিষিদ্ধ করা হয় মানুষের 'ধর্মানুভূতি' তে আঘাত লাগবার অজুহাতে, আরজ আলী মাতুব্বরের 'সত্যের সন্ধান' আর দেবীপ্রসাদ চৌধুরীর 'যে গল্পের শেষ নেই' পড়ার অপরাধে মুক্তিযোদ্ধা ওহাবকে 'জুতোর মালা' পরিয়ে সারা গ্রাম ঘোরানো হয়, তসলিমাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়, মুক্ত বুদ্ধির চর্চা করার জন্য আহমেদ শরীফ-আলী আসগর-কবীর চৌধুরীদের 'মুরতাদ' ঘোষণা করা হয়, চাপাতির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হতে হয় মুক্তমনা অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদকে, আর অপরপক্ষে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে বের করা হয় 'Scientific Identification in Holy Quran' এর মতো ছদ্ম-বিজ্ঞানময় গ্রন্থ। ভক্তি-রসের বান ডেকে অদৃষ্টবাদ আর অলৌকিকত্বের রমরমা বাজার তৈরি করতে চলছে বুকাইলি-মুর-দানিকেনদের বইয়ের ব্যাপক প্রচার আর প্রসার। বাংলাদেশের সারা বাজার এখন 'আল-কোরআন এক মহা বিজ্ঞান', 'মহাকাশ ও কোরআনের চ্যালেঞ্জ', 'বিজ্ঞান না কোরআন', 'বিজ্ঞান ও আল কোরআন' জাতীয় ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক বইয়ে সয়লাব। মুক্তমনা এবং শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের যৌথ প্রয়াসে প্রকাশিত 'স্বতন্ত্র ভাবনা' (চারদিক, ২০০৮) বইটির ভূমিকায় উদ্ধৃত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অজয় রায়ের একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি-

> জ্ঞানের একমাত্র উৎস যদি পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলো হয়, তাহলে সেই সমাজে নেমে আসবে বন্ধ্যাত্ব, সমাজ হবে জড় চেতনা-চিন্তায় আচ্ছন্ন, সৃষ্টিশীলতার স্থান দখল করবে কুসংস্কার, মূর্খতা, কূপমণ্ডূকতা আর অজ্ঞানতা। আমাদের সমাজে দেখা যাচ্ছে কুসংস্কার আর প্রযুক্তিবিদ্যার ফসলকে আত্মস্থ করার পারস্পরিক সহাবস্থান। বিজ্ঞানের যুক্তি চাই না, চাই তার ফসল, পাশে থাক অন্ধবিশ্বাস আর ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পন। এই সমাজেই সম্ভব- ড্রয়িং রুমে রঙ্গিন টেলিভিশন সেট স্থাপন, এবং হিস্টিরিয়া-আক্রান্ত কন্যাকে পীরের চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রেরণ। এই সমাজেই সম্ভব- অণুরসায়নবিদদের রসায়ন চর্চার পাশাপাশি তথাকথিত পীরের পদচুম্বন।

সত্যিই তাই। অদ্ভূত উটের পিঠে সত্যিই বুঝি চলেছে স্বদেশ। বিজ্ঞানের এই অগ্রগামীতার যুগে প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের বাঁধন ক্রমশ যখন শিথিল হয়ে পড়ছে, মানুষের মনে দেখা দিচ্ছে নানা ধরনের সংশয় আর প্রশ্ন, তখনই ধর্ম কেন্দ্রিক নিবর্তন মূলক শোষণ ব্যবস্থা বজায় রাখার মতলবে শুরু হয়েছে এক নতুন ধরনের নিরন্তর মগজ ধোলাই। আর তা হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের মোড়কে মুড়ে ধর্মকে পরিবেশন। কিছু মানুষ রসাল চাটনির মতো তা খাচ্ছে ও বেশ। ধর্মের নেশায় বুঁদ হয়ে মানুষ ভাবতে শিখছে ১৪০০ বছর আগে লেখা 'বিজ্ঞানময়' কিতাবে সত্যিই বুঝি মহা-বিস্ফোরণের কথা আছে, অথবা প্রাচীন কোনো শ্লোকে আছে কাল প্রসারণের ইঙ্গিত। কে দেবে এই মোহান্ধ জাতিকে মুক্তি? ওমর খৈয়ামের একটি কবিতার কথা খুব মনে পড়ছে-

যদি মাতালের শিক্ষাকেন্দ্র মাদ্রাসাগুলো
এপিকিউরাস, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের দর্শন-শিক্ষালয় হতো,
যদি পীর দরবেশের আস্তানা ও মাজারগুলো
গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতো,
যদি মানুষ ধর্মান্ধতার পরিবর্তে

নীতিজ্ঞানের চর্চা করতো,
যদি উপাসনালয়গুলো সর্ববিদ্যাচর্চা-কেন্দ্র
হিসেবে গড়ে উঠত,
ধর্মতত্ত্বের চর্চার পরিবর্তে যদি গণিত বীজ-গণিতের
উন্নতি সাধন করতো,
ধর্ম যা মানবজাতিকে বিভক্ত করে তা
'মানবতা'র দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতো,
পৃথিবী তাহলে বেহেস্তে পরিণত হতো,
পরপারের বেহেস্ত বিদায় নিত,
প্রেম-প্রীতি মুক্তি-আনন্দে জগৎ পরিপূর্ণ হতো নিঃসন্দেহে।

ওমর খৈয়াম বহু বছর আগে যে কথা বলেছিলেন, বাংলাদেশের জন্য সেকথাগুলো আজও কী নিদারুণ সত্য! স্বতন্ত্র ভাবনায় ড. অজয় রায় যেভাবে লিখেছিলেন[24], তার সাথে সুর মিলিয়ে আমাদেরও বলতে ইচ্ছে করে- ওমর তুমি আর একবার আসো এই দেশে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই দেশে, ফতোয়াবাজদের এই দেশে আজ তোমার বড় প্রয়োজন।

24 সাদ কামালী এবং অভিজিৎ রায় (সম্পাদনা), স্বতন্ত্র ভাবনা, চারদিক, ২০০৮